আপন নামা ◆ এম মিরাজ হোসেন

আপন নামা

এম মিরাজ হোসেন

আপন নামা

এম মিরাজ হোসেন

নওরোজ কিতাবিস্তান

প্রকাশক
মনজুর খান চৌধুরী
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১১-৩২১০৮৫

পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ ২০২২
চতুর্থ মুদ্রণ : মার্চ ২০২২
তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
আরিফুল ইসলাম

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স
প্যারিদাস রোড, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-95903-1-6

Apon nama by M. Miraz Hossain Published by Manjur Khan Chowdhury, Nowroze Kitabistan 5 Banglabazar, Dhaka-1100. Mobile. 01711321085, Price: BDT 350.00 Only

ঘরে বসে নওরোজ কিতাবিস্তান এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/Nowroze
ফোনে অর্ডার করতে 015 1952 1971 হট লাইন 16297
e-mail : nowroze.kitabistan@gamil.com

উৎসর্গ

তাকে
যিনি বিচিত্র এই ভূমন্ডলের মহাধিপতি
যার রং, রূপ, আতিশয্যে সাজানো এই ধরিত্রী
সেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে

ভূমিকা

'আপন নামা' আমার আত্মজীবনীমূলক বই। এই বইয়ের প্রতিটি পরতে পরতে রচিত হয়েছে আমার যাপিত জীবনের উপাখ্যান। স্রোতের মতো ভেসে যাওয়া সময়ের গল্প, আবেগ-অনুভূতির গল্প, সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার গল্প। উঠে এসেছে আমার শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও পেশা জীবন। এগুলো তো থাকারই কথা কিন্তু যেসব গল্প থাকার কথা ছিল না সেগুলোও মলাটবদ্ধ হয়েছে এই বইয়ে। জীবন কি গল্পের মতো হয় নাকি গল্পরাই বিমূর্ত জীবন হয়ে ওঠে? হয়তো দুটোই! অব্যক্ত সেসব গল্পরাই স্থান পেয়েছে এই বইয়ে। তবে কিছু মানুষের নাম, স্থান, পরিস্থিতি ও বিষয়বস্তু স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে উদ্ভুত ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়ানোর জন্য। শুধুমাত্র একটি 'আপন নামা' বইয়ে জীবনের সকল গল্প বলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তবু যেসব গল্পরা মাথার ভেতর আপন ইচ্ছেয় ডালপালা মেলে উড়ে বেড়ায় তাদেরকেই পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছি পাঠকদের সাথে। পাঠকরা আমার আপননামা পছন্দ করলে, ভালোবাসলেই আমার এ লেখা সার্থক। করবেনও আশা করি। ভালোবাসা অনিঃশেষ।

এম মিরাজ হোসেন
বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন
গুলশান ০২, ঢাকা-১২১২

সূচিপত্র

আমার বেঁচে থাকাটাই এক মিরাকল ১১
জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু ১৫
দরিদ্রতার সাথে সংগ্রাম ১৯
অনাহূত আশ্রিত জীবন ২৩
ক্লাস সেভেনে ঘর পালানো ২৭
বেনামি প্রেমপত্র ৩৫
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ৩৯
ব্যবসায়িক জীবনের হাতেখড়ি ৪৫
প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ৫১
হংকং উপাখ্যান ৫৫
উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে গমন ৫৯
ট্রেন জার্নি ৬৩
বাংলাদেশ সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়দের ধারণা ৬৭
পাটনায় ট্রেন-ডাকাতি ৭১
সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড ৭৫
র‍্যাগিং কাণ্ড ৭৯
প্রথম জন্মদিন উদযাপন ৯১
কবরস্থানে এক বিভীষিকাময় রাত ৯৯
নতুন মুখের সন্ধানে ১০৯
ব্যবসায় জীবনের সাময়িক বিরতি ১১৫
বিয়ে বিত্তান্ত ১১৯
গার্মেন্টস শিল্পে আমার পথচলা ১২৫
প্রথম বাবা হবার অনুভূতি ১৩১
জাতিসংঘের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ১৩৯
কোমায় ছত্রিশ ঘণ্টা ১৪৭
জীবনের জটিল হিসাব ১৫৫
যাদের কাছে আজন্মকাল ঋণী ১৫৯
পরিশিষ্ট ১৬৩

আমার বেঁচে থাকাটাই
এক মিরাকল

১৯৭৮ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জ জেলায় আমার জন্ম। লৌহজং উপজেলায় ছোট্ট একটি গ্রাম মসদগাঁও। জেলা সদর থেকে অনেকটা ভেতরে হওয়ায় উন্নয়নের ছোঁয়া তখন গ্রামে ছিল না। তবে ছিল সবুজের সমারোহ, মাঠ, বিল আর ক্ষেত। এখনো যখন দুচোখ বন্ধ করি আমি আমার গ্রামকে দেখতে পাই। গ্রামের সেই কাচা রাস্তা, শীতকালে ধুলোয় ঢাকা আর বর্ষা এলে হাটু কাঁদা। এক ক্রোশ পায়ে হেঁটে যাওয়া সেই প্রাইমারি স্কুল, আমাদের খেলার মাঠ, বিলের পানিতে মাছ ধরা আর সবাই মিলে ঝাঁপাঝাঁপি করা। আহা কি মধুর সেই সোনালি দিন!

জীবনের তেতাল্লিশটি বসন্ত পার করে আজ যখন শৈশবের কথা ভাবি তখন মনে হয় বেঁচে থাকাটাই আমার জন্য এক মিরাকেল। আমার জন্ম হয় একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। আমার বাবারা চার ভাই ছিলেন। আর আমাদের পরিবারের সদস্য ছিলেন বাবা, মা, চার ভাই, পাঁচ বোন।

১৯৭৭ সাল। তখন আমি মায়ের পেটে মাত্র আট মাসের এক প্রাণ। আমার বড় ভাই বোনেরাও তখন বেশ ছোট। বাবা জুটমিলে কাজ করতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ, ভাই-বোনেদের দেখাশুনা সব মাকে একাই করতে হতো। সেসময় গর্ভবতী মায়েরা এখনকার মতো নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, এই সুবিধাগুলো পেত না। সংসারের সব কাজ তাদেরকেই করতে হতো। আর সেসময় সব পরিবারেই সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আমি যখন মায়ের পেটে তখন আমার মায়ের স্বাস্থ্য বেশ ভেঙ্গে পড়ে। মায়ের মুখে শোনা, আমার বাকি আট ভাই-বোনদের চেয়ে আমার জন্মের বেলায় মায়ের কষ্ট অনেক বেশি হয়েছিল।

একদিনের ঘটনা। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা খরস্রোতা খাল ছিল। সেই খালের উপর কাঠের একটি পুরনো পুল ছিল। আমার বড় দুই বোন সেই পুলের উপর খেলাধুলা করছিল। ওদের একজনের বয়স তখন চার বছর, আরেকজনের বয়স তিন বছর। খেলতে খেলতে হঠাৎ আমার এক বোন পুল থেকে পানিতে পড়ে যায়। বর্ষাকাল ছিল তখন। খালে অনেক পানি আর বেশ স্রোত। আমার বোন পানিতে পড়ে

যাবার পর অন্য বোনটি জোরে চিৎকার করতে থাকে। আমার মা তখন বেশ অসুস্থ। মেয়ের চিৎকার আশেপাশের আর কারো কানে না গেলেও আমার মা ঠিকই শুনতে পেয়েছিল। আমার মা তখন তার অসুস্থতা ভুলে দৌড়ে ছুটে যায় পুলের কাছে। গিয়ে দেখতে পায় আমার বোন খালের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। সে সময় আশে পাশে কেউ ছিল না সাহায্য করার মতো। অসুস্থ মা, পেটে আট মাসের আমি। গর্ভাবস্থার সেই সময় ভারি কাজ, অধিক নড়াচড়া পুরোপুরি নিষেধ। কিন্তু মা দেখলেন তার এক আদরের সন্তান পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখনই পানি থেকে না তুললে তাকে বাঁচানো যাবে না। মা তখন তার নিজের স্বাস্থ্য, গর্ভে আমার অবস্থা, কোন কিছু চিন্তা করতে পারেননি। তার বুকের ধনকে বাঁচাতে হবে, এটাই ছিল তার ভাবনা। মা সেই গর্ভাবস্থায় তখন খালের পানিতে ঝাঁপ দেয় আমার বোনকে উদ্ধার করার জন্য। নিচে অথৈ পানি আর প্রচণ্ড খরস্রোত। আমার মা প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলেন আমার বোনকে বাঁচাতে। আল্লাহ মায়ের এই চেষ্টাকে বিফল হতে দেননি। প্রায় ত্রিশ মিনিট স্রোতের সাথে লড়াই করে আমার মা আমার বোনকে পানি থেকে পাড়ে তুলে আনেন।

আমার বোন তখন অজ্ঞান। ডাক্তার এবং গাঁয়ের অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় প্রায় ১ ঘণ্টা পর আমার বোনের জ্ঞান ফিরে আসে। আমার বোন নতুন জীবন ফিরে পায়। কিন্তু এতে করে মায়ের পেটে আমার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। মায়ের দুর্বল শরীর তার উপর পানিতে প্রায় ৩০ মিনিট যুদ্ধ করার ফলে গর্ভে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। মা এ ঘটনার পর অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে যায়। শহরে নিয়ে আসা হয় মাকে ভালো চিকিৎসার জন্য। সেখানকার ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানান আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদিও বেঁচে যাই তাহলে বিকলাঙ্গ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

১৯৭৮ সালে আমার জন্ম হয়। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া আর রহমতে আমি আজও সুস্থভাবে বেঁচে আছি। এর জন্য শোকর গুজার করি আল্লাহর দরবারে আর বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই আমার মাকে। যিনি না থাকলে এই সুন্দর পৃথিবী দেখার সুযোগ আমার হতো না। মা আজ বার্ধেক্যে এসে উপনীত হয়েছেন। আল্লাহর দরবারে মুক্ত মনে দোয়া জানাই, দুনিয়ার সকল মায়েদের আল্লাহ ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন। আর যে মায়েরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ তাদের বেহস্তে নসীব করুক। রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা।

জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু

যেহেতু আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি থেকে এসেছি এবং আমার ভাই বোনের সংখ্যা বেশি ছিল। তাই আমার বাবা আমাদের সবাইকে পড়াশোনার খরচ যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছিল। মিন্টু নামে আমার এক বড় ভাই ছিলেন। তিনি আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচাইতে বড় ছিলেন। গল্প-উপন্যাসে আমরা রাজপুত্রের যে বর্ণনা পড়ি আমার বড় ভাই ছিলেন হুবহু সেই রাজপুত্রের মত। পার্থক্য শুধুই এটুকু আমার বাবা রাজা ছিলেন না; একজন ছাপোষা চাকুরিজীবী ছিলেন। প্রচণ্ড মেধাবী, সুদর্শন আমার ভাইটি খেলাধুলায়ও বেশ দক্ষ ছিলেন। তার এত গুণের কারণে শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রতিবেশীরাও তাকে পছন্দ করত।

মিন্টু ভাইয়ের বয়স যখন সাত তখন হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর আমার ভাইটা বিছানায়ই পড়ে ছিলেন অনেক দিন। মিন্টু ভাইকে সুস্থ করার জন্য আমার মা দিনরাত সেবা শুশ্রূষা করতেন। বাবা তার সামর্থ্য অনুযায়ী কত চিকিৎসক, কত ওষুধ যে নিয়ে এসেছিলেন আমার ভাইকে সুস্থ করার জন্য! কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ভাইয়ের অবস্থা খারাপের দিকেই যেতে থাকে। যদিও এসবই আমার মা এবং বড় বোনদের কাছ থেকে শোনা কারণ তখনও আমি পৃথিবীর আলো দেখিনি।

মিন্টু ভাই যেদিন মারা যায় সেদিন ঝুম বৃষ্টি ছিল। আকাশ তার রুঢ় মূর্তি নিয়ে কেঁপে উঠছিল বারবার। ভাইয়ের গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। বরফ দিয়েও তার শরীরের তাপমাত্রা কমানো যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর মিন্টু ভাই বলতে লাগলেন তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। কুপির আলোতে আমার মা দেখতে পেলেন আমার ভাইয়ের মুখে তীব্র যন্ত্রণা এবং ভয়ের স্পষ্ট ছাপ। হঠাৎ ভাইয়া বাবাকে বললেন, বাবা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি মনে হয় মারা যাচ্ছি। তাই না বাবা? আমাকে বাঁচাও বাবা। বাবা মা অঝোরে কেঁদেই যাচ্ছিলেন। বাবা ডাক্তার ডাকতে যেতে চাইলে মিন্টু ভাই বাবার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল আর বারবার বলছিল, বাবা আমার খুব ভয় করছে। তুমি আর মা আমার কাছে থাকো। কিছুক্ষণ পরেই আমার ভাই মায়ের কোলেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন এবং বাবা মিন্টু ভাইয়ের হাতটি ধরে চুপ করে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার বড় বোন তখন ছোট। ও কিছু বুঝতে না পেরে একবার বাবা, একবার মার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মিন্টু ভাইয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ও তখন মনে করেছিল তার বড় ভাই হয়তো প্রতিদিনের মত ঘুমিয়ে গেছে।

একজন বাবার কাছে তার সন্তানের লাশ বহনের চাইতে কষ্টের কোনো কাজ এই পৃথিবীতে মনে হয় নেই। আমার বাবা মিন্টু ভাইয়ের লাশ যখন বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন নাকি বাবা একেবারে চুপচাপ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন কাফনে মোড়ানো মিন্টু ভাইয়ের লাশের দিকে। মিন্টু ভাইয়ের মৃত্যুর পর বাবা প্রথমে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিলেন আর পাগলামি করছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি একদম নিশ্চুপ হয়ে যান। মিন্টু ভাইকে যখন কবরে নামানো হচ্ছিল আমার বাবা তখন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন। যে সন্তান তার কোলের উপর খেলেছে, আধো আধো বোলে বাবা বলে ডেকেছে, হাঁটতে শিখেছে, হাত ধরে প্রথম স্কুলে গিয়েছে, বাবার কাছে বসে পড়াশোনা করেছে সেই সন্তানকে বাঁচাতে না পারার তীব্র কষ্ট বাবা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছেন। এই অবর্ণনীয় কষ্ট শুধুমাত্র বাবারাই বুঝতে পারবেন। আমার বাবা আর কখনোই পুত্রবিয়োগের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বাবার মানসিক ভারসম্যহীনতার শুরু তখন থেকেই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আর স্বভাবিক হতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই বিলাপ করতেন, আমার ছেলেটা আমার কাছে বাঁচতে চেয়েছিল। আমি পারিনি বাঁচাতে। কি নিষ্ঠুর এই পৃথিবী!

দরিদ্রতার সাথে সংগ্রাম

আমরা নিতান্তই দরিদ্র পরিবারে বড় হয়েছি। আমার বাবা একটা জুটমিলে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। নয় ভাই-বোনের বিশাল পরিবার নিয়ে আমাদের মা একা গ্রামে থাকতেন। আমরা মঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ বলতে দেশের উত্তরাঞ্চলকে বুঝি। সেসময় মুন্সিগঞ্জ জেলাও অর্থনৈতিক ভাবে বেশ দুর্বল ছিল। আমার এখনো মনে পড়ে ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে ঠিকমতো চুলা জ্বলতো না। বছরের বিশেষ একটা সময় আমাদের ৯ ভাই-বোনকে তিনবেলা খাওয়ানোর সামর্থ্য আমার অসহায় মায়ের ছিল না। আমাদের অনেকদিন গেছে সারদিনে একবেলা খেয়ে কাটিয়েছি। ভাত সে তো রাজ খাদ্য! মুন্সিগঞ্জ জেলাতে আলুর ফলন ভাল হয়। সেসময় আমরা সারদিনে একবেলা শুধুমাত্র আলু সেদ্ধ খেয়ে কাটাতাম। কালেভদ্রে ভাত খাবার সুযোগ পেতাম। এক মুঠো ভাতের জন্য চাতক পাখির মতো উন্মুখ হয়ে থাকতাম। ভাত যে কি জিনিস যারা ঊনভাতে থাকে কেবল তারাই বুঝবে।

আমাদের দরিদ্রতার একটি ঘটনা যা আমি কখনই ভুলতে পারি না। আজও যখন সে ঘটনা মনে পড়ে আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমার বয়স তখন ছয় বছর। রাত আটটা বাজে। গ্রামে রাত আটটা বাজা মানে অনেক রাত। সবাই খেয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আমি, আমার ছোট ভাই ও ছোট বোন রান্নাঘরের পাশে বসে আছি। ঘুমাতে পারছি না কারণ সারাদিনে তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। আমার ছোট বোনটি ক্ষুধায় কান্না করছিল। ওর বয়স তখন মাত্র সাড়ে তিন বছর। আমরা বারবার মাকে বলছিলাম, মা ক্ষুধা লাগছে। আমাদের খেতে দাও।

মা চুলায় রান্না চড়িয়েছিল। মা আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আরেকটু সহ্য কর বাবারা। এইতো একটু পরেই ভাত রান্না হয়ে যাবে। আমরা তিনজন খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। রান্না হয়ে গেলে মা

আমাদের খেতে দিবেন। আমি ওদের মধ্যে বয়সে বড় ছিলাম বলে ওদের চুপ করিয়ে রাখছিলাম। আমার ছোট বোনটা ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ হবার পরেও যখন ভাত রান্না হচ্ছিল না, তখন আমি নিজে গিয়ে চুলায় রাখা হাড়ি চেক করতে গেলাম। ঢাকনা উঠিয়ে দেখলাম, হাড়িতে ভাত না, শুধু পানি গরম হচ্ছিল। দরিদ্রতার সেই মুহূর্তে আমাদের ঘরে কোন চাল ছিল না রান্না করার মতো। আমাদের অসহায় মা তার ছোট ছোট বাচ্চাদের সে কথা বলতে পারেনি। সে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য হাড়িতে পানি দিয়ে চুলোয় চড়িয়েছিল।

এই ঘটনা আজও আমাকে তাড়া করে। আমার সেই ছোট বোনটার নিষ্পাপ মুখ আমার চোখে ভেসে উঠে। অনেক রাতে আমি এই স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি। সেই আদরের বোনটা আজ অনেক বড় হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ও আজ অনেক ভালো আছে। আমার সেই ছোট বোনটাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সব সময় ভালো রাখুক।

অনাহূত আশ্রিত জীবন

আমার জীবনের প্রায় আঠারো বছর কেটেছে বাবা ছাড়া। যদিও আমার বাবা বেঁচে ছিলেন কিন্তু বাবার সাথে আমার খুব বেশি দেখা হয়নি। কর্মসূত্রে আমার বাবা চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু আমার বাবা ছোটখাটো একটা চাকুরি করতেন তাই বেতনও ছিল অল্প। এ বেতনে বাবার নিজের থাকা খাওয়া পরাই শুধু চলতো। আমাদের কোনো টাকাই পাঠাতে পারতেন না। আগেই বলেছিলাম মিন্টু ভাই মারা যাবার পর আমার বাবা মানসিকভাবে অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার এ মানসিক অবস্থায় আসলে চাকুরি করাটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু উনি যেহেতু একজন কর্মঠ কর্মী ছিলেন তাই কোম্পানি মানবিক কারণে তাকে চাকুরিতে বহাল রেখেছিলেন। বাবা চট্টগ্রাম চলে যাবার পর আমরা সপরিবারে উঠলাম আমার মামার বাড়িতে। শুরু হলো আমাদের আশ্রিত জীবন!

আমার কাছে মনে হয় অন্যের প্রাসাদে আশ্রিত থাকার চাইতে নিজের ছনের ঘরে দিন পার করা বেশি সম্মানের, স্বস্তির। মামার বাড়িতে আমাদের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার তেমন কোনো জায়গা ছিল না। স্রেফ খাবার আর মাথার উপরে এক টুকরো ছাদ, এই ছিল আমাদের জন্য বরাদ্দ। যদিও আমার বড় মামা সাধ্যমত আমাদের মানুষ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

এক ঈদের কথা আমার মনে পড়ছে খুব। সেবারের ঈদে বাবার আমাদের সাথে ঈদ করার কথা থাকলেও উনি আসতে পারেনি। তো ঈদের আগে মামা বাড়ির সবাই নতুন জামা, জুতো কিনেছে কিন্তু আমাদের নিয়ে কেউ ভাবেনি। হয়তো বা ভেবেছিল খাবার পাচ্ছে, আশ্রয় পাচ্ছে এই ঢের। আবার নতুন কাপড়! আমরও যেহেতু ছোট ছিলাম আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মাকে গিয়ে বলেছিলাম, মা সবাই নতুন কাপড় পরে ঈদ করবে। আমরা কি এই

পুরনো কাপড় পরে ঈদ করব? আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর মা দিতে পারেননি। তবে মায়ের চোখের জল আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। হাজার হোক মা তো! মা মামাকে গিয়ে হয়তোবা বলেছিলেন আমাদের নতুন কাপড় কিনে দেওয়ার কথা, হয়তোবা লজ্জায় বলতে পারেননি। হয়তো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ঈদের আগের দিন রাতে আমার মা দেখলাম আমাদের তিনভাইকে তিনটি শার্ট দিয়ে বলল, এই নে তোদের নতুন শার্ট। এটা পরেই তোরা কাল ঈদ করবি। আমরা খুব খুশি হয়ে শার্ট নিলাম। একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখলাম শার্টের কাপড় আমাদের খুব পরিচিত। আমার মায়ের একটা নতুন শাড়ি ছিল। সেই শাড়ি কেটে আমাদের তিন ভাইকে মা তিনটি শার্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের শাড়ি দিয়ে বানানো সেই শার্ট দিয়ে আমরা তিন ভাই ঈদ করলাম। ঐ শার্টটি আমার কাছে প্রায় পনের বছর ছিল। আমি যখন বিদেশে ছিলাম তখনও সেই শার্টটি আমি আমার কাছে রেখেছিলাম। আজ আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন অনেক অনেক নতুন কাপড় কেনার কিন্তু আমার মায়ের বানানো সেই শার্টটি স্পর্শ করলে যে অনুভূতি হতো সেই অনুভূতি আর কখনো পাওয়া যাবে না।

আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার মামা এবং আত্মীয় স্বজনের সহায়তায় আমার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। আমার বড় বোনদের বিয়ে হওয়ার পর আমার বোনেরা এবং দুলাভাইয়েরা আর্থিক এবং মানসিকভাবে আমাদের কিছুটা সাপোর্ট দিতে থাকেন।

ক্লাস সেভেনে ঘর পালানো

১৯৮৯ সাল। ঢাকার একটা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি তখন। বাবা তখন চট্টগ্রামে চাকুরি করেন। আমরা ঢাকায় মামাদের সাথে থাকি। ছোট একটা ফ্ল্যাটে চার রুমে আমরা ভাই-বোন, মা, মামারা, তাদের পরিবার, সব মিলিয়ে প্রায় ষোল-সতের জন মানুষ কোনরকমে কষ্ট করে থাকি। বিশাল বড় পরিবারের কর্তা প্রধান ছিলেন মামারা। সেসময় বাড়িতে কিছু কঠোর নিয়ম চালু ছিল। সারদিনে যে যার কাজ করে অবশ্যই সন্ধ্যায় আজানের আগে বাসায় ফিরতে হবে। সন্ধ্যার পরে বাসায় ফেরাটা এক বড় অপরাধ বলে গণ্য হতো। আর এর শাস্তিও ছিল খুব কঠিন। আমরা ছোটরা সবাই তখন চেষ্টা করতাম স্কুল, টিউশনি, খেলাধুলা, সবকিছু সন্ধ্যার আগে শেষ করে বাসায় ফিরে আসতে।

একবার এর ব্যতিক্রম হয়ে গেল। আমাদের খেলার মাঠটা ছিল আমাদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে। একদিন সবাই মিলে ফুটবল খেলতে খেলতে সময়ের খেয়াল ছিল না। খেলা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। দুরু দুরু বুক নিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। ভেতরে ভীষণ ভয় হচ্ছিল আজ না জানি কি শাস্তি পেতে হয়। বাসার সামনে আসতেই দেখি গেটের সামনে মামা দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলাম মামাকে কিভাবে আজকের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। মামার কাছে আসতেই আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মামা আমার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় দেয়, আর ভীষণ গাল-মন্দ করে। সে আমাকে আরো মারবে এরকমটা বুঝতে পেরে আমি দৌড়ে মামার কাছ থেকে পালিয়ে আসি।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাসা থেকে অনেক দূরে রাস্তায় চলে আসি। আমার যতটা না কষ্ট লাগছিল তারচেয়ে বেশি অভিমান হচ্ছিল। আমি কখনোই এর আগে দেরি করে বাসায় ফিরিনি। একদিন মাত্র দেরি

হয়েছে মামা এটা মেনে নিতে পারল না! আমাকে কিছু বলার সুযোগই দিল না। মামা এমনিতে আমাকে বেশ আদর করতেন। তাই তার কাছে থেকে এই আচমকা শাসন কোনভাবেই আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। একদমই না।

ঘড়িতে সময় তখন রাত সাড়ে আটটা। রাস্তায় এদিক ওদিক হাঁটছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না আমি ঠিক কি করব। বাসায় গেলে হয়তো মামা আবার মারবেন। তাই বাসায় ফিরে যাব না, এটা নিশ্চিত ছিলাম। এভাবে রাস্তায় অনেকক্ষণ এদিক ওদিকে হাঁটাহাঁটি করলাম। একসময় আমার এক ক্লাসমেট জুম্মুনের সাথে দেখা হলো। আমরা দুজন একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়তাম। ও দেখল আমি মনমরা, কান্না-কান্না চোখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। ও আমার কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোর?

আমি ওকে বললাম দেরি করে বাসায় ফেরার কারণে মামা খুব বকেছে আর মেরেছে। তাই বাসা থেকে পালিয়ে এসছি। তো ও জিজ্ঞেস করল কিছু খেয়েছি কি না। আমার পেটে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল। সেই দুপুরের পর আর কিছুই খাওয়া হয়নি। ওকে বললাম যে না কিছু খাইনি। তখন আমাদের দুজনের কারো কাছে কোন টাকাও নেই। ও কিছুক্ষণ ভেবে বলল চল আমার সাথে দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়। পরে ও আমাকে ওর বাসার দিকে নিয়ে গেল। বয়সে ও আমার মতোই ছোট হওয়ায় এক বন্ধুকে রাতে খাবার জন্য বাসায় নিয়ে যাবে, বাসায় কি ভাববে এই চিন্তা করে আমাকে ওর বাসায় নেবার সাহস পেল না। ও আমাকে একটা মসজিদের সামনে বসতে বলে বলল, তুই এখানে বস। আমি দেখি বাসায় গিয়ে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি কি না।

ও এরপর বাসায় গিয়ে একটা প্লেটে করে লুকিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এল আমার জন্য। এতটাই ক্ষুধার্ত ছিলাম তখন গোগ্রাসে যা ছিল তাই হাপুসহুপুস করে খেলাম। এরপরে সমস্যা হলো রাতে থাকব কোথায়? ও আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে না, আমিও কোন মতেই বাসায় ফিরে যাব না। ও তখন জিজ্ঞেস করল, তোর আশেপাশে

আত্মীয় স্বজন কে আছে? ঢাকাতে মামারা ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। ওকে বললাম, গ্রামে শুধুমাত্র আমার দাদি আছে। ও বলল, বেশ! তুই তাহলে আজকের রাতটা কোনরকম মসজিদে কাটা। কাল সকালে তুই আর আমি মিলে তোদের গ্রামের বাড়ি যাব।

আমি সেই রাতটা মসজিদে কাটালাম। জুম্মুন পরদিন সকাল সকাল চলে এল। আমার সাথে কোন টাকা নেই তাই ও আসার সময় বাসা থেকে কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে আসল। এবার আমরা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবো।

এর আগে একা আমি কখনোই কোথাও যাইনি। বয়সে এতো ছোট ছিলাম কিন্তু কিভাবে ঢাকা থেকে গ্রামে যেতে হয় এইটা আমার খেয়াল ছিল। প্রথমে সদরঘাট যেতে হয়, এখানে থেকে বিক্রমপুর লৌহজংয়ের লঞ্চে চড়তে হয়। সেই লঞ্চে চড়ে বালিগাও নামে একটা ঘাটে নামতে হয়। এরপর বালিগাও থেকে টমটমে চড়ে ঘোরদৌড় যেতে হয়। সেখান থেকে হেঁটে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাটা আমার ভালোভাবে মনে আছে।

তো আমরা দুজন প্রথমে সদরঘাট থেকে লঞ্চে চড়লাম। তখন ভাড়া ছিল খুবই কম। দুইজনই ছোট হওয়ায় দুইজনে মিলে একটা টিকিট কাটলাম। লঞ্চ চলছিল। গতকালকে মামার হাতে মার-বকুনি খাওয়া, বাসা থেকে পালিয়ে আসা, নিজের ভেতরের দুঃখ, অভিমান, এই ব্যাপারগুলো আমাদের মধ্যে তখন কাজই করছিল না। বরং দুইজনে মিলে একসাথে বেড়াতে যাচ্ছি এই আনন্দই হচ্ছিল। দুজনের মধ্যেই এডভেঞ্চার ফিলিং কাজ করছিল। এরপর যখন লঞ্চ থেকে বালিগাও ঘাটে এসে নামলাম তখন বিকাল হয়ে গেছে। ওখান থেকে ঘোরদৌড় আরো এক ঘণ্টার রাস্তা। আমরা একটা টমটম গাড়ি খুঁজে পেলাম। গাড়িওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে তোমরা? আমরা বললাম, আমরা দুজন ঘোরদৌড় যাব। আমাদের কাছে ভাড়া আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের কাছে তখন দুইজনের মতো ভাড়া ছিল না। আমরা বললাম যে, আমাদের কাছে টাকা আছে কিন্তু পুরো ভাড়া নেই। আমাদের দেখে হয়তো ড্রাইভারের মায়া হলো। সে বলল, ঠিক

আছে তোমরা উঠো, যা আছে তাই দিও। ড্রাইভারটা বেশ ভালো ছিল। আমাদের সাথে থাকা সামান্য কিছু টাকাতেই আমাদেরকে ঘোরদৌড় পৌঁছে দিয়েছিল।

ঘোরদৌড় পৌঁছে আমরা দুজনে গ্রামের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। ঘোরদৌড় থেকে আমাদের বাসায় হেঁটে যেতে লাগে পনের মিনিটের মতো। সময় তখন রাত প্রায় আটটা। সে সময় গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না। রাত আটটা মানে ভালোই রাত। সব মানুষ সন্ধ্যা বেলাতেই বাসায় ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় পৌঁছালাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এশার নামাযের জন্য আমার দাদি অযু করতে বাইরে বেড়িয়ে আমাকে দেখে চমকে ওঠেন। দাদির সাথে আমার তখন প্রায় দুই বছর পর দেখা। দাদির বয়স সেসময় প্রায় পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বছর হবে। উনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু এত রাতে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন। উনি আমার কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন যে এত রাতে আমরা এখানে কিভাবে এলাম।

আমরা বাসার ঘটনাটা বললাম না। বরং দুজনে মিলে একটা উল্টাপাল্টা কাহিনী বানিয়ে বললাম। দাদি বৃদ্ধা মানুষ, উনি আমাদের আর বেশি ঘাটালেন না। আমাদের কথা বিশ্বাস করে দুজনকে ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে অতিরিক্ত খাবার ছিল না। দাদি সে রাতে কোন মতে কিছু ভাত চড়িয়ে দিয়ে ডাল, ডিম দিয়ে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে আমরা দুজন গ্রাম ঘুরতে বের হলাম। গ্রামে এসে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। অন্য ছেলেদের সাথে হই-হুল্লোড়, ছুটোছুটি, খেলাধুলা, বিলে ঝাঁপিয়ে গোসল করা, কলাগাছ কেটে ভেলা বানানো, বড়শিতে মাছ ধরা, শাপলা তোলা, দুজনে মিলে সাঁতার শেখার চেষ্টা করা, সবমিলিয়ে আমাদের দুজনের খুব মজার সময় কাটতে লাগল গ্রামে। বাসার জন্য কিছুটা চিন্তা যে হচ্ছিল না তেমন না। বিশেষ করে মায়ের জন্য খারাপ লাগছিল। তবুও দুজনে মিলে আনন্দ করার মধ্যে সব দুঃশ্চিন্তা হারিয়ে গিয়েছিল। আমার বন্ধু

জুম্মুন আনন্দ পাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। এর আগে ওর গ্রামে সময় কাটানোর তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না।

এভাবে দুই দিন খুব আনন্দ করে কাটানোর পর আমার দাদির কিছুটা সন্দেহ হয়। আমার এক চাচা থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। দাদি চাচার কাছে খবর পাঠালেন এই বলে যে, দুইদিন ধরে টিটু আর ওর এক বন্ধু গ্রামে এসে থাকতেছে। তুই একটু ওদের বাসায় খোঁজ নেতো কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি? বলে রাখি আমার ডাকনাম ছিল টিটু।

ওদিকে দুইদিন যাবত আমি বাসা থেকে নিখোঁজ। বাসা থেকে পুলিশে রিপোর্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে, মর্গে খোঁজ নেওয়া হয়ে গেছে। আমার মা, মামারা আশেপাশে তন্নতন্ন করে আমাকে খুঁজছে। আমার বন্ধুদের বাসায় খোঁজ নিচ্ছে। সবমিলিয়ে একটা মর্মান্তিক অবস্থা বিরাজ করছে।

আমার চাচা আমাদের ঢাকার বাসায় খোঁজ নিয়ে সব জানতে পারেন। এরপর উনি সরাসরি গ্রামে চলে আসেন। আমাদেরকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসেন। আমার তখন খুব ভয় হচ্ছিল বাড়িতে গেলে আমাকে কি না কি বলে। তো চাচা আমাকে সরাসরি বাড়িতে না নিয়ে আমাকে আমার বোন-দুলাভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেন।

দুলাভাই তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বোকামিটা তুই কেন করলি? মামা তোকে সামান্য শাসন করেছে। তাই বলে কি বাসা থেকে পালিয়ে যেতে হবে? কাউকে কিছু না বলে বাসা থেকে পালিয়ে গেলি। একবার ভেবেছিস তুই পালিয়ে যাবার পর বাসার অবস্থা কি হবে?

আমি তখন বললাম, মামা আমাকে অনেক জোরে মেরেছে আর অনেক বকেছে। এর আগেও মামা আমাকে অনেকবার মেরেছে। সামান্য একটা জিনিসের জন্য ছোটদের এভাবে মারতে হয়? আমার গালে তখনও মামার থাপ্পড়ের দাগ ছিল। আমি দুলাভাইকে সেটা দেখালাম।

পরে দুলাভাই আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাসায় নিয়ে গেলেন। বাসায় গিয়ে দেখি কান্নার রোল পড়ে গেছে। সবাই ভেবে নিয়েছিল আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছি। আমাকে পেয়ে সবাই খুব খুশি হলো।

পরে মা-মামারা বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করলেন বাচ্চাদের এরকম শাস্তি যেন আর কখনো না দেওয়া হয়।

ওদিকে জুম্মুনের বাসায় ও একই অবস্থা। জুম্মুনও বাসা থেকে কিছু না জানিয়েই আমার সাথে পালিয়ে গিয়েছিল।

বন্ধু জুম্মুন এখনো আমার বন্ধু। এখনো ওর সাথে যোগাযোগ হয়। কখনো আলাপ করতে করতে ছোটবেলায় বাসা থেকে পালিয়ে যাবার ঘটনা চলে আসে। দু'জনই তখন হাসতে থাকি। কি সব দিন পার করেছি আমরা। স্মৃতির পাতায় এখনও ভাস্বর হয়ে আছে।

বেনামি প্রেমপত্র

প্রতিটি মানুষের জীবনেই প্রেম আসে। প্রেম-ভালোবাসা এমন এক আবেগ, যা কখনো কোন কিছু দিয়ে আটকানো যায় না। প্রথম প্রেমের বিষয়টি সব কিছু থেকে একটু আলাদা। প্রথম প্রেমের সে অনুভূতি সহজে ভোলা যায় না। একদল গবেষক বলছে, প্রথম প্রেম, অনেকটাই স্কাইড্রাইভ বা প্রথমবার আকাশ থেকে লাফ দেওয়ার মতো ঘটনা। প্রথমবারের ঘটনাটি যেভাবে মনে গেঁথে যায়, আর দশবার লাফ দিলেও সেই আগের স্মৃতিটাই বেশি নাড়া দিয়ে যায়।

আগে প্রেমের সাথে প্রেমপত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে ছিল। এখনকার ছেলে-মেয়েরাও প্রেম ভালোবাসা করছে। ইন্টারনেটের যুগে ম্যাসেঞ্জার কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে টুক করে একটা মেসেজ জানিয়ে দিচ্ছে। সীন করে রিপ্লাই পেয়েও যাচ্ছে। তাই তারা কোন ভাবেই বুঝতে পারবে না আমাদের সময়কার সেই অনুভুতি! চিঠি দিয়ে সেই চিঠির জন্য অপেক্ষা, চিঠির পাওয়ার অনুভূতি, চিঠি ধরা পরে যাওয়ার ভয় আরও কত সে অনুভূতি যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না।

জীবনে অদ্ভুতুড়ে একটা চিঠি পাবার ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। সেসময় আমি ক্লাস টেনে পড়ি। আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে ছিল। ওর বিভিন্ন হাবভাবে বুঝতে পারতাম ও আমাকে পছন্দ করে। হাবভাব গুলো ছিল এরকম : ক্লাসে কাছাকাছি থাকার সময় জোরে জোরে কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা, যেচে নিজ থেকে কথা বলা, আমার ব্যাপারে জানার অনেক আগ্রহ প্রকাশ করা, ক্লাসে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, এরকম আরকি।

এখনকার ছেলে-মেয়েদের মতো নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করার সাহস কিংবা চর্চা তখন আমাদের ছিল না। ওর এসব ইঙ্গিত যে আমি বুঝতাম না তা না। আমি, আমার বন্ধুরা সবাই এটা বুঝতাম। কিন্তু কেন যেন প্রেমের প্রতি তখন আমার আগ্রহ হতো না। আমার কাছে ক্লাস করা, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করা, সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া, এসবই ছিল পছন্দের কাজ। কাউকে ভালোবাসবো, আলাদা করে

তাকে নিয়ে ভাববো, তার জন্য আলাদা সময় বের করব, এই ব্যাপারগুলোতে আমার আগ্রহ জাগতো না। আর তাছাড়া মেয়েটা সরাসরিও কখনো কিছু বলতো না। এভাবেই চলছিল আমাদের দিন।

দশম শ্রেণিতে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর আমি একদিন একটা চিঠি পাই। খামে আমার নাম লেখা একটা চিঠি। প্রেরকের নাম লেখা অনামিকা। চিঠির সাথে আমার তেমন সম্পর্ক ছিল না। আমি নিজেও কাউকে চিঠি দেইনি, আমাকেও কেউ চিঠি দিত না। তাই সেই চিঠিটা পেয়ে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। বেশ কৌতূহল নিয়ে খাম খুলে পত্রটা বের করি।

এখনকার রাস্তা ঘাটে, বাসে চড়ার সময় তরুণ ছেলেরা আমাদের হাতে যেসব জীবনের শেষ চিকিৎসা নামে কবিরাজি ভেষজ চিকিৎসার লিফলেট ধরিয়ে দেয় ঠিক সেরকম একটা লিফলেট সেই চিঠির মধ্যে। তাতে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, সকল প্রকার জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা করা হয়। আপনার কোন শারীরিক অক্ষমতা থাকলে, পুরনো ব্যাধি থাকলে এখনই চলে আসুন আমাদের কবিরাজ বাড়িতে। এখানে গ্যারান্টি সহকারে চিকিৎসা করা হয়। বিফলে অর্থ ফেরত।

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কি ধরনের রসিকতা! কে করল আমার সাথে এই কাজ! কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না প্রেরক কে হতে পারে। পরবর্তীতে জানতে পারলাম আমাকে পাঠানো সেই চিঠির প্রেরক আমার ক্লাসের সেই মেয়েটি। যেটা হতে পারত মনের অনুভূতি ব্যক্ত করে মিষ্টি প্রেমের চিঠি। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে কবিরাজি চিকিৎসার লিফলেট।

আজও যখন ভাবি মেয়েটা কেন সেদিন ওরকম চিঠি পাঠিয়েছিল, বুঝতে পারি না। হয়তো অনেকদিন মেয়েটা আশায় ছিল আমি ওর ইশারায় সাড়া দেব। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরেও যখন তার ভালোবাসার মূল্যায়ন সে পায়নি, তাই অভিমান করে কবিরাজি চিকিৎসার লিফলেট পাঠিয়ে ধিক্কার জানিয়েছে আমাকে।

যাইহোক, সেটাই ছিল আমার প্রথম প্রেমের চিঠি। এরপরও অনেক চিঠি পেয়েছি। মনের অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে চিঠি, সহজ স্বীকারোক্তির চিঠি, অদ্ভুত অনুভূতির চিঠি, নিষ্প্রভ পাথরের চিঠি অথবা চিঠির থেকেও বেশি কোনকিছু। কিন্তু সেই প্রথম বেনামী চিঠির মতো আর কোন চিঠি মস্তিষ্কের খেরোখাতায় স্থান পায়নি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

আমি যখন হাই স্কুলে ভর্তি হলাম তখন পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলাম। যেহেতু প্রাইভেট টিউটর রাখার মত আর্থিক অবস্থা আমাদের ছিল না তাই নিজের চেষ্টায় এবং বড় বোনদের সহায়তায় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকলাম। এভাবেই নবম শ্রেণিতে উঠলাম। নবম শ্রেণিতে উঠে অনেকগুলো নতুন সাবজেক্ট নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেলাম। গণিত, একাউন্টিং ও ইংলিশ সাবজেক্টগুলো ঠিক বুঝতে পারতাম না। স্যারদের কাছে কোনো কিছু বোঝার জন্য গেলে উনারা বলতেন পাঁচশত টাকা দাও তোমাকে পড়াচ্ছি। সে সময়ে পাঁচশত টাকা মানে অনেক টাকা। এতো টাকার সংস্থান করা আমার জন্য রীতিমত অসম্ভব ছিল।

অবশেষে আমার মা এক আত্মীয়ের সহায়তায় অনেক কষ্ট করে আমাদের পাঁচ ভাই বোনের জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন। আমাদের শিক্ষকের নাম ছিল প্রকাশ স্যার। হাসিখুশি এই মানুষটি টাকার দিকে না তাকিয়ে আমাদের পড়িয়েছিলেন। তিনি তার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন আমরা যেন সঠিক শিক্ষাটা পাই। যদিও আমরা ভাই-বোনেরা ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে থাকায় সবাইকে আলাদা করে শিক্ষা দেওয়া বেশ দুরূহ ছিল। আল্লাহ তাআলা এই মহান মানুষটিকে ভালো রাখুন।

এভাবেই প্রকাশ স্যারের সহায়তায় চলতে থাকল আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি। সব বিষয়ে প্রস্তুতি ভালো থাকলেও অংক নিয়ে আমি মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। টেস্ট পরীক্ষা আসল। আমি টেস্ট পরীক্ষায় অংকে মাত্র আঠারো নম্বর পেলাম। আমাকে তো স্কুল থেকে কোনোভাবেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দিবে না। আমি শিক্ষকদের হাতে পায়ে ধরলাম কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হলেন না।

তখন আমাদের স্কুলের এক স্যার ছিলেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব পছন্দ করতেন। উনার কাছে গিয়ে আমার ফ্যামিলির অবস্থা খুলে বললাম এবং অংকে আমার দুর্বলতার বিষয়টা বললাম। স্যারকে বললাম যে স্যার আমি ঐকিক নিয়ম আর সরল অংক ছাড়া কিছুই বুঝি না। স্যার সব শুনে বললেন, ঠিক আছে আমি তোকে অংকে সহায়তা করব। কিন্তু আমিতো সারাদিন ব্যস্ত থাকি দেখিসই তো। আমি তোকে সপ্তাহে চারদিন সময় দিব কিন্তু তোকে ফজরের নামাজের পর আসতে হবে। আমি সানন্দে স্যারের কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

শুরু হলো স্যারের কাছে আমার অংক শেখা। ঐ বয়সে ফজরের নামাজের পর পড়তে আসাটা বেশ কঠিন ছিল। তবুও আমি অংক শেখার জন্য ফজরের নামাজ পড়েই স্যারের বাসায় চলে যেতাম। স্যার আমাকে প্রথমেই বললেন, যেহেতু সময় খুব কম আর তুইও অংকে বেশ কাঁচা। তুই আপাতত পাশ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়ের অংক শুরু কর। আমিও বাধ্যগত ছাত্রের মত শুরু করলাম অংক কষা। স্যার আমাকে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন দুর্বোধ্য বিষয়গুলো, সেই সাথে দিতেন একগাদা বাড়ির কাজ। কিছুদিন পর আবিষ্কার করলাম আমি অংক নামক ভীতিকে ধীরে ধীরে জয় করছি। আমার মনে তখন কনফিডেন্স এলো। এখন যাইহোক, অংকে আমি আর ফেল করব না। তিন সপ্তাহ পরে স্যার নিজে আমার একটা পরীক্ষা নিলেন। আমি পাশ করে গেলাম।

স্যার তখন আমাকে প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমার রেজাল্ট শিট দেখিয়ে বললেন, স্যার এই হচ্ছে ওর রেজাল্ট। আমি নিজে ওর পরীক্ষা নিয়েছি, ও পাশ করেছে। আমাদের প্রধান শিক্ষক খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি কার অনুমতি নিয়ে একা একা ওর পরীক্ষা নিয়েছেন? আপনাকে তো ওকে আলাদা করে পরীক্ষা নিতে বলা হয়নি। তাছাড়া আপনি তো সবার সামনে পরীক্ষা নেননি। তাহলে কিভাবে বুঝব যে ও আসলে পাশ করেছে? আর এটাতো নিয়ম বহির্ভূত।

তখন আমার সেই অংক শিক্ষক স্যারকে বললেন, স্যার আপনি চাইলে আপনিও ওর পরীক্ষা নিতে পারেন। এ ছেলে মাধ্যমিকে অংকে পাশ যদি না করে আমি আপনার স্কুল থেকে ইস্তফা দিয়ে দিবো। তখন হেডস্যার বললেন যে, আপনি এইমাত্র যে কথাটা বললেন সেটা একটা কাগজে লিখিত আকারে দিয়ে দিন। স্যার একটা সাদা কাগজে লিখলেন, মিরাজ অংকে পাশ করবে। তখন হেডস্যার আমাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি দিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক আগের মুহূর্তে আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেল যে আমার এখন সংসারের হাল না ধরলে আর চলছে না। একদিকে আমার পরীক্ষা অন্যদিকে সংসারের এই হাল। আমি পড়ে গেলাম উভয় সংকটে। তারপরও চিন্তা করলাম এত কষ্ট করে যেহেতু প্রস্তুতি নিয়েছি, পরীক্ষা দিয়ে দেই তারপর যা করার করব। মজার বিষয় হচ্ছে আমার আত্মীয় স্বজন এবং স্কুলের শিক্ষকেরা ধরেই নিয়েছিল আমি এসএসসি পাশ করতে পারব না।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম এবং আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আমার মায়ের দোয়ায় বেশ ভালোভাবে আমি ম্যাট্রিক পাশ করলাম। এক্ষেত্রে একটু নিজের রেজাল্টের কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আমি ১৯৯৩ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিলাম। সে সময়ে আমার জানামতে আমিই একমাত্র বাংলায় লেটার মার্কস পেয়েছিলাম। এমনকি যে অংকে আমি ফেল করেছিলাম সেই অংকেই আমি লেটার মার্কস পেয়েছিলাম। মোট আটটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে আমি ঢাকা বোর্ডের মধ্যে মেধাতালিকার বিশজন এর মধ্যে ছিলাম। আমার স্কুল টিচার, আমার আত্মীয়স্বজনেরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমার বাংলা শিক্ষক বলেছিলেন, বাংলায় লেটার কিভাবে পেলিরে বাবা? অন্য সাবজেক্টে লেটার পেয়েছিস বুঝলাম তাই বলে বাংলায়? আমার সেই মহান অংকের শিক্ষক শুধু বলেছিলেন, অনেক কষ্ট করেছিস বাবা। মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।

সেদিন আমার সেই শিক্ষককে ধন্যবাদ দিতে পারিনি। শুধু সেদিন না এরপরেও যতবার স্যারের সাথে দেখা হয়েছে তখনও পারিনি। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা ভয়ে। প্রতিবারই মনে হয়েছে ধন্যবাদ নামক শব্দটা উনার জন্য ছোট হয়ে যায়। আজ আমার এই আত্মজীবনীর মাধ্যমে স্যারকে আমার অব্যক্ত ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম। স্যার, আমার এ শ্রদ্ধার্ঘ্যটুকু আপনি গ্রহণ করুন।

ব্যবসায়িক জীবনের হাতেখড়ি

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কিভাবে সংসার চালাব এটা নিয়ে ভাবছি। পড়াশোনার পাশাপাশি কিভাবে টাকা কামানো যায় এটা নিয়েও ভাবতে থাকলাম। যেহেতু চাকুরির প্রতি ইচ্ছে খুব একটা ছিল না তাই চিন্তা করলাম ব্যবসায়ই করব। কিন্তু ব্যবসা করতে তো অনেক অর্থের দরকার। এত অর্থ আমি কোথায় পাব? ভাবতে ভাবতে এক বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে কিছু ধার-দেনা করে শুরু করলাম মুরগী খামারের ব্যবসা। কিন্তু মুরগীর ব্যবসা সফল হলো না। শুধু পরিশ্রমই যে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নয় সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম। কারণ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও পর্যাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য উপাদান না থাকার কারণে মুখ থুবড়ে পড়ে আমাদের প্রথম ব্যবসা।

হতাশ হয়ে পড়লাম। আবার চিন্তা করতে বসলাম কি করব। তখন আমার এক বড় ভাই আমাকে বললেন, চা পাতার ব্যবসা শুরু করতে। সিলেটে চা পাতার নিলাম হয়। ওখান থেকে পাইকারি মূল্যে চা পাতা কিনে এনে অন্যখানে বিক্রয় করার ব্যবসা। যদিও বেশ লাভজনক ব্যবসা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নিলামে চা পাতা কিনতে হলে লাইসেন্স লাগে এবং অনেক অর্থের দরকার। পরিচিত কাউকে খুঁজতে গিয়ে পুরনো ঢাকার কাপ্তান বাজারে একজন চা ব্যবসায়ীকে পেয়ে গেলাম। উনাকে সব খুলে বলার পর উনি বললেন, তুমি আমার লাইসেন্স ব্যবহার করে চা পাতা কিনে নিয়ে আসতে পারো। আমি বললাম আমার কাছে তো টাকা নেই। উনি বললেন তুমি কোন জায়গা পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ টাকা নিয়ে আসো আর বাকি টাকাটা আমি দিয়ে দুই-তিন লক্ষ টাকার পুঁজি দিয়ে ব্যবসাটা শুরু করি। আমি টাকার সন্ধানে বেরিয়ে পরলাম।

যদিও সে পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা জন্য প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই ছিল কিন্তু কপাল ভালো থাকায় টাকা যোগাড় করতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। আমার ছোট দুলাভাইয়ের এক কাকা আমাকে অবাক করে দিয়ে রাজি হলেন আমাকে ব্যবসার জন্য দুই লক্ষ টাকা ধার দিতে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে লাভের অর্ধাংশ তাকে দিয়ে দিতে হবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

শুরু হলো আমার চায়ের ব্যবসা। ব্যবসায়ের নাম দিলাম "বাংলাদেশ টি"। নিলাম থেকে চা কিনতে গিয়ে দেখলাম অনেকগুলো ব্রান্ডের এবং গ্রেডের চা পাতা বিক্রি হয় চায়ের হাটে। যেমন ফিনলে, এইচআরসি, ইস্পাহানি ইত্যাদি। তো আমি চিন্তা করলাম এগুলো যেহেতু বাজারে প্রচলিত ব্রান্ড তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাকে ভিন্ন কিছু করতে হবে। ভাবতে ভাবতে মাথায় একটি আইডিয়া খেলে গেল। আমি খেয়াল করে দেখলাম বাজারে বড় প্যাকেটের চা পাতা পাওয়া গেলেও মিনি প্যাক চা পাতা পাওয়া যায় না। এছাড়াও চায়ের দোকানগুলোতে একটু কমদামি চা পাতার বেশ ভালো চাহিদা। তাই আমি চিন্তা করলাম আমি নিজেই যদি চা পাতা কিনে এনে নিজে প্যাকেট করে বিক্রি করি তাহলে বেশ ভালো মুনাফা হবে।

মিরপুরের দিকে তিন হাজার টাকা দিয়ে কারখানার জন্য একটা ছোট ঘর ভাড়া নিলাম। তখন মিরপুরের দিকে ভাড়া বেশ কম ছিল। আমি বিভিন্ন গ্রেডের চার পাঁচটা কোম্পানির চা পাতা কিনে এনে একসাথে মেশাতাম। আমার মাথায় ছিল যে তৈরিকৃত চা পাতার মূল্য যেন বাজারের অন্যান্য ব্র্যান্ডের চাইতে কম হয় এবং চা দোকানদারেরা স্বল্পমূল্যে ক্রয় করতে পারে। আমি নিজে, বন্ধু বান্ধব এবং সেলস অফিসারদের নিয়ে নেমে পড়লাম "বাংলাদেশ টি" বিক্রি করতে। প্রথম প্রথম দোকানদারেরা নতুন ব্র্যান্ড দেখে চা পাতা কিনতে চাইতো না। কিন্তু যখন তারা দেখল আমার চা পাতার মান প্রায় অন্যান্য ব্যান্ডের চা পাতার সমমানের এবং দামও

কম তাই ধীরে ধীরে আমার চা পাতার বিক্রি বাড়তে লাগল। ছয় মাসের মধ্যে আমার ব্যবসার পরিধি এতটাই বেড়ে গেল যে, আমি অর্ধেক ধার শোধ করেও নতুন করে ব্যবসায়েও মূলধন বিনিয়োগ করি। মূলত আমার জীবনের পরিবর্তন আসে এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে।

চা ব্যবসায়ে সফলতা পাওয়ার মাধ্যমে আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আমি নতুন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার চিন্তা করি। খুঁজতে খুঁজতে মাথায় আসে জিন্স আইটেম নিয়ে ব্যবসা করি না কেন? তখন জিন্স আইটেম খুব ব্যয়বহুল ছিল আর চাহিদাও ভালো ছিল। সে সময় সাধারণত মধ্য-উচ্চবিত্তরাই শুধুমাত্র জিন্স প্যান্ট কিনতে পারত। এরমধ্যে এলিফ্যান্ট রোডের আলপনা প্লাজাতে ভালোমানের জিন্স পাওয়া যেত। তখন একটা ভালোমানের জিন্সের মূল্য ছিল পাঁচশ-ছয়শ টাকা। ছয়শ টাকা কিন্তু তখন অনেক টাকা। কারণ তখনকার সময়ে ছয়শ টাকায় নিম্নবিত্ত অনেক পরিবারের সারা মাসের বাজার খরচ চলে যেত। চিনুদা নামে আমার পূর্ব পরিচিত এক হিন্দুব্যবসায়ী ভদ্রলোক এই জিন্স ব্যবসায়ের যুক্ত ছিলেন। যেহেতু বাংলাদেশে জিন্স প্যান্ট ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে তাই তিনি আমাকে হংকং এ গিয়ে জিন্স আনার ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করলেন।

ব্যবসা করতে হলে হংকং যেতে হবে। তাই আমি গোপনে একটা পাসপোর্ট করলাম এবং হংকং যাওয়ার জন্য টিকেট ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করলাম। যাওয়ার ঠিক আগের দিন রাতে আমার মাকে বললাম, মা আমি কাল হংকং যাব একটা ব্যবসার কাজে। আমার কথা শুনে মা মনে হলো আকাশ থেকে পড়ল। এখানে একটা কথা বলা উচিত আমি যখন হংকংয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি তখন আমার বয়স আঠারোও হয়নি। আর হংকং এ আমার পরিচিত কেউই নেই। একজন কিশোর যে কিনা একা বিদেশ ভ্রমণ করবে তাও আবার ব্যবসায়ের কাজে! এ কথা শুনলে যে কেউই ভিমড়ি খাবে, আমার

মায়েরই বা দোষ কি! আমার মা তো কেঁদে কেটে অস্থির। মায়ের কথা হচ্ছে আমি একা একটা মানুষ কত বিপদ আপদ হতে পারে বিদেশ বিভূঁইয়ে। শেষমেষ অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজি করালাম। মায়েরা বোঝেন। কারণ তাদের বুঝতে হয়।

প্রথম বিদেশ ভ্রমণ

হংকং যাওয়ার দিন আমার ফ্লাইট ছিল ড্রাগন এয়ারলাইন্সে। জীবনের প্রথম এয়ারপোর্টে আসলাম আমি। কিভাবে কি করতে হবে কিছুই জানি না। একে ওকে জিজ্ঞেস করে ইমিগ্রেশনে চলে গেলাম। এখানে একটা মজার বিষয় আপনাদের বলি। আমার আসল বয়স তখন ষোল চলছিল কিন্তু আমি পাসপোর্টে বয়স দেখিয়েছিলাম একুশ! কারণ ষোল বছর বয়স জানলে আমাকে যেতেই দিত না। আমার এক বন্ধুর পরামর্শে যাওয়ার কিছুদিন আগে থেকে সেভ করা বন্ধু করে দিয়েছিলাম। যাতে বয়স বেশি মনে হয়। তো ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা একবার আমার দিকে এবং একবার পাসপোর্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল হংকং কেন যাচ্ছি? আমি বললাম ব্যবসার কাজে যাচ্ছি। এরপর আমার ভিজিটিং কার্ডটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে ভিজিটিং কার্ডের দিকে একবার তাকিয়ে, মোটামুটি আশ্চর্য হয়ে যাবতীয় ফর্মালিটিস শেষ করে আমাকে লাউঞ্জে গিয়ে বসতে বললেন। আমি বসে বসে ভাবছি কিভাবে কি করব। উপরে উপরে খুব সাহস বজায় রেখে চললেও ভিতরে চলছে দুশ্চিন্তার ঝড়। কিছুক্ষণ পর বিমানের গেটের দিকে রওনা হলাম। বিমানে উঠে পড়লাম আরও বড় মুশকিলে। যে মুসিবত সিন্দাবাদের ভূতের চেয়েও বড়।

বিমানে উঠেই শুনলাম মাইকে ঘোষণা করছে নির্দিষ্ট আসনে বসার জন্য। আমি উঠেছি প্রথম প্লেনে কোনটা কি ক্লাস, কোনটা কত নং সিট এগুলো কিছুই বুঝছিলাম না। আমাকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক এয়ার হোস্টেজ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল কোনো সমস্যা কিনা। আমি বললাম আমার সিট নম্বর খুঁজে পাচ্ছি না। উনি আমাকে সহায়তা করল সিট খুঁজতে। সিটে বসলাম।

জীবনের প্রথম প্লেন ভ্রমণ নিয়ে খুবই উত্তেজিত ছিলাম। প্লেন কিভাবে উড়বে? কত সময়ে পৌঁছাবে এসব চিন্তা যখন করছিলাম তখন মাইকে

পাইলটের ঘোষণা শুনলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেন উড্ডয়ন করবে, সবাই নিজ নিজ সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন। আমি সিট হাতড়ে সিট বেল্টতো পেলাম কিন্তু কিভাবে এটা বাঁধতে হয় সেটা তো জানি না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা লাগছিল। তাই সিট বেল্টটা ধরে বসে রইলাম! এমন সময় সুন্দরী একজন বিমানবালা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি সিট বেল্ট বাঁধছি না কেন? সুন্দরীদের সামনে কেই বা চায় নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলুন! আমি বললাম সিট বেল্টে সমস্যা বাঁধতে পারছি না। তখন উনি আমার সিটবেল্ট বাঁধা শুরু করতেই বিমান চলতে শুরু করল। ঝাঁকুনি খেয়ে বিমানবালা আমার উপর পড়ে গেল। আমার তখন কিশোর বয়স। এ ঘটনায় লজ্জার পাশাপাশি একটু প্রেম প্রেম পেতে লাগল! যাইহোক সে আমাকে সরি বলে সিট বেল্ট বেঁধে দিয়ে বলল আরও কোনো কিছু দরকার হলে যেন উনাকে জানাই। আমিও সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়ালাম। বিমান উড়তে লাগল আকাশে।

প্রথম বিমান ভ্রমণে অনেকেরই বমি হয়। আমার এরকম কোনো সমস্যা না হলেও দুরুদুরু মনে ভাবছিলাম প্লেন যদি দুর্ঘটনায় পড়ে বা যদি উড়তে উড়তে হারিয়ে যায় তখন কি হবে! এই বিমান ভ্রমণের কিছুদিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম যেখানে প্লেন দুর্ঘটনা ঘটে এবং প্লেনটি একটি গহীন জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। তো প্লেন চলতে থাকল কিছুক্ষণ পর খাবার পরিবেশন করা হলো। খাবার খেয়ে ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙলো কয়েক ঘণ্টা পর। পাইলট ঘোষণা করল কিছুক্ষণ পর আমরা হংকং বিমানবন্দরে অবতরণ করব।

হংকং উপাখ্যান

হংকং শহরটা বেশ ছোট শহর। ঢাকা শহরের চাইতে হয়তো খুব একটা বেশি বড় হবে না। পার্ল নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা এ শহরের দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর। ঘনবসতিপূর্ণ এ শহরে এসে আমার প্রথম মনে হলো আমি কি ভুলে হংকং না এসে ঢাকায় চলে আসলাম! যাইহোক হংকং এসে আমি শ্যাডল জিন্সের ডিলার প্রতিষ্ঠানে গেলাম। চিনুদার কথামতো জিন্সের সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝে নিতে থাকলাম। হিসাব কষে দেখলাম এ ব্যবসায় বেশ ভালো মুনাফা থাকে। হংকংয়ের বাজারে ঘুরতে ঘুরতে আরও একটি জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার এবং রিস্টওয়াচ। দেশে থাকাকালীন সময় শুনেছিলাম ইলেকট্রনিক্স এই আইটেমগুলো নিয়ে ব্যবসা করার বেশ ভালো সুযোগ আছে বাংলাদেশে।

হংকং শহর পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল এক শহর। হোটেল থেকে শুরু করে খাবারের দাম এবং ভাড়া সবখানেই অত্যাধিক মূল্য। যেহেতু হংকং ছিল বাণিজ্যিক শহর তাই এরকম দ্রব্যমূল্যের দাম হওয়াটাই বেশ স্বাভাবিক। আমি যেহেতু বেশি টাকা নিয়ে আসিনি এবং ব্যবসায়ের কাজে গিয়েছিলাম তাই চেষ্টা করেছিলাম যতসম্ভব খরচ বাঁচাতে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। আরও একটি কারণ ছিল তাড়াতাড়ি আসার। যেহেতু তখন বিদেশ থেকে বাংলাদেশের মোবাইল ফোনে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না তাই আমার মাকে বেশিদিন দুশ্চিন্তায় রাখতে মন চাচ্ছিলো না। বেশ কিছু জিন্স, সার্কিট ব্রেকার এবং রিস্টওয়াচ লাগেজে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম বাংলাদেশের দিকে।

উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে গমন

১৯৯৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর আমার স্কলারশিপ হয় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কলারশিপ পেয়ে সাথে সাথে এম্বাসিতে ভিসার জন্য আবেদন করি। যতটা আশা করিনি তার চেয়েও দ্রুত ভিসা পেয়ে গেলাম। কিন্তু টিকিট কিনতে গিয়ে আমাকে বেশ বেগ পোহাতে হয়। সেসময় আমাদের আর্থিক অবস্থা ততোটা ভালো ছিল না। যদিও স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছি তবুও প্রথম টিউশন ফিশ এবং ওখানে যাওয়া বা থাকার জন্য প্রাথমিক যে খরচ সেটা নিজেকেই বহন করতে হতো। ওখাকার হোস্টেল খরচ, খাওয়ার খরচ, যাতায়াত খরচ এবং সরকারী কিছু পারমিশন খরচ বাবদ আমার প্রায় পনের হাজার রুপির প্রয়োজন ছিল। সেসময় আমার একটা ছোট বিজনেস ছিল। দুইজনের কাছে সেই বিজনেসের দায়িত্ব সমর্পণ করে আমি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ট্রেন জার্নি

জীবনে প্রথমবারের মতো ভারতে যাচ্ছি। কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা ভীতি কাজ করছে। আমার সাথে বাংলাদেশি আরো চারজন স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র ছিল যারা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে। সবাই স্টুডেন্ট আর আর্থিক সংগতির কারণে সেকেন্ড ক্লাস স্লিপিং বার্থে চড়ে যাত্রা করেছিলাম।

ভারতে পৌঁছে ভারত সম্পর্কে আমার ভাবনা আর অভিজ্ঞতার বিস্তর ফারাক খুঁজে পেলাম। এর আগে আমি ভারতকে চিনতাম সিনেমা দেখে। সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং, বড় বড় অফিস, শপিংমল, পরিপাটি রাস্তাঘাট। আমার কল্পনায় ভারত ছিল এরকম একটা দেশ। আর তখন অব্দি আমি ভাবতাম বাংলাদেশই বোধহয় সবচেয়ে গরীব দেশ। কিন্তু ভারতে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমি ভারতকে যেরকম ছিমছাম দেশ ভেবেছিলাম, ভারত মোটেই সেরকম দেশ নয়। ওখানেও আমাদের দেশের মতো যানজট আছে, রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ আছে, দরিদ্রতা আছে। ভারত আমাদের দেশের মতোই একটা দেশ।

সেসময় টুকটাক সিগারেট খাবার অভ্যাস ছিল। ভারতে পৌঁছে বিপাকে পড়লাম; ওদেশে অন্য দেশের সিগারেট পাওয়া যাচ্ছিল না। সব দোকানেই ওদের লোকাল ব্র্যান্ডের সিগারেট বিক্রি হতো। আমরা যারা বাংলাদেশি সিগারেট ব্র্যান্ড যেমন : বেনসন, গোল্ড লিফ, নেভি ইত্যাদির সাথে অভ্যস্ত ছিলাম তাদের কাছে ওখানকার লোকাল সিগারেট একদমই অখাদ্য লাগতো। যদিও শুনেছিলাম কলকাতার কিছু দোকানে বাংলাদেশি সিগারেট পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো খুবই দুষ্প্রাপ্য আর দামেও খুব চড়া। আমাদের মধ্যে দুইজন সাথে করে ৫৫৫ এবং বেনসন সিগারেট নিয়ে গিয়েছিল। ওগুলোই ছিল অন্ধের যষ্টির মতো আমাদের সবার ভরসা।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়দের ধারণা

ট্রেনে আমাদের সাথে ব্যাঙ্গালোরের দুইটা ছেলে জার্নি করছিল। ওরা আমাদের হাতে বেনসন সিগারেট দেখে বেশ অবাক। এত দামি সিগারেট ব্র্যান্ড বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের হাতে! এটা ওদের কাছে যেন আশ্চর্যকর একটা বিষয়। ওদের ধারণা বাংলাদেশ একটা অতি দরিদ্র দেশ। সবাই এদেশে না খেয়ে থাকে, ভালো জামা-কাপড় ওরা চিনে না। ব্যাপারটা আরো প্রকট হলো যখন দেখলাম ট্রেনের অন্য যাত্রীরা এসে আমাদের পড়নের জিন্স প্যান্ট, কেডস, ক্যাপ এসব খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল। এগুলোর দাম, কোথা থেকে কিনেছি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল।

ওদের আরেকটা ধারণা, আজকের বাংলাদেশ হয়েছে ওদের জন্য। অর্থাৎ ভারতের কারণে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভারতের যুদ্ধের ফল। আর এই ধারণা যে শুধু নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা না। ভারতের যে সকল শহরে আমার যাওয়া হয়েছে, যেমন : কলকাতা, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, পন্ডিচেরি, হায়দ্রাবাদ, লাখনৌ, সেকেন্দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ম্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, দার্জিলিং, শিমলা, সব জায়গার ভারতীয়দের মধ্যে আমি একই রকম মনোভাব দেখতে পেয়েছি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা এসবকে ওরা কোন গুরত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে করে না। ভারতের সাহায্য না পেলে বাংলাদেশ কখনই স্বাধীন হতে পারত না, আজীবন পাকিস্তানের অধীনে থেকে কামলা-খেটে বাঁচতে হতো। সকল যুদ্ধ, ত্যাগ, সংঘর্ষ পাকিস্তানের সাথে ভারতের হয়েছে। এই যুদ্ধের জন্য ভারতকে অনেক কিছু উৎসর্গ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের গন্ডগোলের সময় অসংখ্য শরণার্থীদের

ভারত আশ্রয় দিয়েছে। যারা পরবর্তীতে আর দেশে ফিরে আসেনি। তারা এখনো অবৈধভাবে ভারতে বাস করছে। তাই এই স্বাধীনতায় বাংলাদেশিদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। বাংলাদেশ সম্পর্কে এই যে বদ্ধমূল ধারণা, বংশ পরম্পরায় এটা চলে আসছে।

পাটনায় ট্রেন-ডাকাতি

ট্রেন চলতে চলতে এক সময় পাটনা স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। কিছুক্ষণ পর আচমকা ট্রেনের সকল যাত্রী তাড়াহুড়ো করে ট্রেনের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিতে লাগল। আমরা সবাই হকচকিয়ে গেলাম। কি হলো হঠাৎ করে! আমরা ভাবলাম ট্রেনে বোধহয় ডাকাত হামলা হয়েছে। আমরা বাংলাদেশি চারজন ভয়ে একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলাম। খানিক পরে ট্রেনের একজনকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। লোকটা মুচকি হেসে বলল, কি হয়েছে জানতে চাও? তাহলে জানালা খুলে দেখো।

আমাদের চারজনের মধ্যে কান্তি দাস খুব কৌতূহল নিয়ে ট্রেনের একটা জানালা খুলে দিল। ওমনি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এসে আমাদের কম্পার্টমেন্ট ভরে গেল। এতো দুর্গন্ধ ছিল যে আমাদের পেট থেকে সব কিছু বের হয়ে যাবার উপক্রম। এর কারণ বুঝতে পারলাম কিছুক্ষণ পর। ট্রেন লাইনের দু'ধারে শতশত লোক সকালের প্রাতঃক্রিয়া করছে। আমরা আসলে এমন একটা গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম যেখানে কোন টয়লেট নেই। এলাকার লোক সাধারণত ট্রেনের দুই পাশে ঝোপঝাড়ে তাদের প্রাতঃক্রিয়া করে থাকে। আর এজন্যই এখানে এত দুর্গন্ধ। যারা এই পথের নিয়মিত যাত্রী তারা এই ব্যাপারটা ভালো করেই জানে। তাই এই জায়গায় ট্রেন আসলেই সবাই দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়।

সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ট্রেনে যেসব সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার দেওয়া হয় তা আমাদের মতো বাংলাদেশিদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব না। সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড বলতে আমরা সাধারণত ইডলি, দোসা, সাম্বারকে বুঝি। অনেকে হয়তো আমাদের দেশে এগুলো খেতেও পছন্দ করে। কিন্তু অরিজিনাল সাউথ ইন্ডিয়ান যেই ইডলি, দোসা, আমার ধারণা সেটা অধিকাংশ বাঙালি মুখে দিতে পারবে না। এর স্বাদ আমাদের দেশে পাওয়া ইডলি, দোসার চেয়ে পুরোপুরি ভিন্ন। আমাদের দেশে আমাদের রুচির মতো করে বানানো হয়। তো যারা ভারতে গিয়ে ইডলি-দোসা খাওয়ার প্ল্যান করছেন তারা আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েন।

হোস্টেলে পৌঁছালাম

প্রায় একত্রিশ ঘণ্টা জার্নি করে অবশেষে আমরা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "সাতাক হোস্টেল" এ গিয়ে পৌঁছালাম। তখন সকাল আটটা। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে হোস্টেলের সব নিয়ম-নীতি সব বুঝিয়ে দিলেন। হোস্টেলটা ছিল বেশ বড়। প্রায় চারশ শিক্ষার্থী ওখানে থাকতো। প্রথমে আমার রুম ছিল নীচ তলায়, ০২৫ নাম্বার রুম। আমার রুমে তিনটা বেড ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার রুম মেট ছিল দুইজন বাংলাদেশি। সিরাজগঞ্জের ছেলে রুমি আর নারায়ণগঞ্জের ছেলে সঞ্জয়। নতুন দেশে, নতুন জায়গায় বাংলাদেশি রুমমেট পেয়ে আমরা তিন জনই অনেক খুশি ছিলাম।

সকাল নয়টায় সবাই মিলে ডাইনিংয়ে খেতে গেলাম। খাবার খেতে গিয়ে আবার সেই বিপত্তি। উগমা ও সাম্বার নামে দুইটি খাবার আমাদের দেওয়া হলো যার কোনটাই আমরা মুখে দিতে পারিনি। আমার প্রায় বমি চলে আসছিল। ওগুলো আমার আর খাওয়া হলো না। সাথে মহিষের দুধ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে আমি কখনো

মহিষের দুধ খাইনি। ক্ষুধা পেটে কোনরকম দুধটুকু খেয়ে আমি চলে আসি। এরপর দুপুর বেলাতে দেওয়া হয়েছিল নারিকেল দিয়ে রান্না করা চামড়া সহ মুরগীর মাংস। সাউথ ইন্ডিয়ায় রান্নাতে ওরা নারিকেল রাখতে পছন্দ করে। আর ওরা ভাতের মধ্যে এক ধরনের পাতা দেয় যা টকটক স্বাদ তৈরি করে। প্রথম প্রথম অনেকেই এই খাবারগুলো খেতে পারে না। একদম না।

র‍্যাগিং কাণ্ড

সবার জীবনেই কিছু না কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা থাকে, কিছু খারাপ সময় থাকে, যা সে কখনো মনেও করতে চায় না। আমার জীবনের সেই অনাকাঙ্খিত একটি অধ্যায়ের নাম র‍্যাগিং। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। র‍্যাগিং।

ইউনিভার্সিটির দোড়গোরায় যেসব শিক্ষার্থীর পা পড়েছে তারা এই শব্দটির সাথে খুব ভালো ভাবে পরিচিত। এছাড়া মিডিয়ার কল্যাণে সাধারণ মানুষও আজ র‍্যাগিং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। কি এই র‍্যাগিং? কোথা থেকে এল এই চর্চা?

র‍্যাগিং শব্দের প্রচলিত অর্থ-পরিচয় পর্ব। র‍্যাগিং শুরু হয় গ্রিকে সপ্তম ও অষ্টম শতকে। র‍্যাগিং মূলত দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রয়েছে। তবে অনুরূপ সংস্কৃতি বিশ্বের আরো অনেক দেশেই বিদ্যামান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন শিক্ষার্থীদের সাথে নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচিত হবার প্রক্রিয়াকে বলা হয় র‍্যাগিং। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এই পরিচয় পর্ব রুপ নিয়েছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিকৃত আনন্দের মাধ্যম। নতুন বছরে নতুন আশা নিয়ে নবীন শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তাদের মুখোমুখি হতে হয় র‍্যাগিং নামক অপসংস্কৃতির। পরিচয় পর্ব আর আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন শেখানোর নামে তাদের ওপর চালানো হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে আছে কান ধরে ওঠবস করানো, রড দিয়ে পেটানো, পানিতে চুবানো, উঁচু ভবন থেকে লাফ দেয়ানো, ভবনের কার্নিশ দিয়ে হাঁটানো, এমনকি দিগম্বর করা পর্যন্ত। আর মানসিক নির্যাতনের মধ্যে আছে গালিগালাজ করা, কুৎসা রটানো, নজরদারি করা এবং নিয়মিত খবরদারি করা। র‍্যাগিং শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে

অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যায়, কেউ আত্মহত্যা করে, কাউকে কাউকে ডাক্তারের শরণাপন্নও হতে হয়। ক্যাম্পাসে আসা নবীনদের সর্বদাই র‍্যাগিং এর ভয়ে ভীত থাকতে হয়। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই চর্চা হয় এমনটা নয় এবং সব প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং-এর ধরণও একরকম নয়।

র‍্যাগিং-এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় সেই ইউনিভার্সিটির সাতাক হোস্টেলে।

শুরু-সকাল

বেলা দশটা। পানি খাবার জন্য রুম থেকে বের হতেই দেখি কয়েজন সিনিয়র দাঁড়িয়ে আছে। একজন আমাকে হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। আমি কাছে যাওয়ার পর আমাকে ইংলিশে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? নতুন আসছো নাকি? কোন প্রোগ্রাম? ধমকের সাথে আমাকে প্রশ্নগুলো করা হলো। আমি যথেষ্ঠ বিনয়ের সাথে সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। পিছন থেকে আরেক ছেলে জিজ্ঞেস করল, এই তুমি যে এখানে আসছো, এখানকার নিয়ম কানুন কি জানো না? আমি বললাম যে আমি নতুন। তাই সব নিয়ম-কানুন এখনো ঠিক জানিনা।

তখন আমার পড়নে ছিল ফুল শার্ট আর প্যান্ট। শার্টের হাতা লাগানো ছিল।

সেই ছেলেটা তখন চোখ পাকিয়ে আমাকে বলল, তোমার সাহস তো কম না! তুমি সিনিয়রদের সামনে শার্টের হাতের বোতাম লাগিয়ে রাখো। এখুনি খুলো বলছি।

শার্টের হাতের বোতাম লাগিয়ে রাখলে তাতে সিনিয়রদের কিভাবে অসম্মান করা হয় এটা আমি বুঝলাম না। কিন্তু এটা নিয়ে তাদের সাথে কোন বিতন্ডায় না গিয়ে আমি হাতের বোতাম খুলে হাতা ফোল্ড করে নিলাম। আর তাদেরকে দুঃখিত বললাম।

ভবিষ্যতে আর যেন তাদের সামনে হাতা লাগিয়ে না চলি ওয়ার্নিং দিয়ে তখনকার মতো তারা আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি সামনে পানির কলের কাছে যাওয়ার পর দেখি আরেকটা গ্রুপ। তারাও

আমাকে একই প্রশ্ন করল, নাম কী, কবে আসছি, কোন রুমে থাকি। আমি তাদের কাছে আরেকবার আমার পরিচয় দিলাম। তাদের মধ্যে থেকে একটা ছেলে তখন আমাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সিনিয়রদের দেখলে যে নমস্কার দিতে হয় এটা কি তুমি জানো না?"

আমি ভয় পেয়ে প্রথমে দুঃখিত বলে তাকে নমস্কার দিলাম। এরপর সে আবার আমাকে ধমক দিয়ে বলল, তুমিতো দেখি চরম বেয়াদব। এখানে আমার সাথে যারা আছে তারা কি তোমার বন্ধু হয়? তাদেরকে নমস্কার দাওনি কেন? তুমি যেহেতু তাদেরকে নমস্কার না করে বেয়াদবি করছো, এখন পায়ে হাত দিয়ে তাদেরকে তোমার সালাম করতে হবে।

জীবনে এতো বড় অপমান আর বিব্রত অবস্থায় কখনোই আমি পরিনি। লজ্জায় তখন আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছি, পরিচিত কেউ নেই। নতুন পরিবেশ এমন অবস্থায় কার কিরকম অনুভূতি হতো আমি জানি না তবে আমি সেসময় লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলাম।

ওরা সবাই লাইন ধরে দাঁড়াল। আমি একে একে সবার পা ধরে সালাম করলাম। এরপর অন্য আরেকজন আবার ধমক দিল।

তোমার হাতা গুটানো কেন? তুমি কি মাস্তান? হোস্টেলে রংবাজি করতে আসছো? এখনি হাতা নামাও। নামাও বলছি। আর কলারের উপরের বাটনও লাগাও।

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে শার্টের হাতা নামালাম, কলারের উপরের বোতাম লাগালাম। সে সময় আমার সাথে যাকির নামে বাংলাদেশি একটা ছেলে ছিল। ওকেও একই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। আমি কোনরকম চোখের পানি আটকে রাখতে পারলেও যাকির হাউমাউ করে কাঁদছিল।

ওদের র‍্যাগিং এর একটা বৈশিষ্ট ছিল, ওরা যা বলতো কেউ যদি তা করতে না চাইতো বা কান্নাকাটি করত তাহলে শাস্তি আরো বাড়িয়ে দিত। যাকির কান্না করায় ওকে অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে হোস্টেলের পুরো মাঠে এক রাউন্ড চক্কর দিতে হয়েছিল।

রুম নাম্বার ১৮৫

দুপুরে খাবার পর আমরা তিনজন রুমে এসে একটু শুয়ে জিড়িয়ে নিচ্ছিলাম। অনেক বড় ট্রেন জার্নির কারণে আমরা সবাই খুব ক্লান্ত ছিলাম। শোয়া মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দরজায় দুম দুম আওয়াজ। ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলার পর দুইটা ছেলে আমাদের বলল আমাদের তিনজনকে ১৮৫ নাম্বার রুমে তলব করা হয়েছে। ১৮৫ নাম্বার রুম ছিল সে সময়ে কুখ্যাত একটা রুম। সবচেয়ে কঠিন কঠিন র‍্যাগিং ঐ রুমের সিনিয়ররা দিয়ে থাকতো। দুপুরে খাবার টেবিলে অন্য নতুনদের মুখে ঐ রুমের কথা আগেই শুনে ছিলাম। আমার সেসময় ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। সকাল বেলা পৌঁছানোর পর থেকে ইতিমধ্যে দুই দফা র‍্যাগিং হয়ে গেছে আমাদের। এখন ঐ রুমে নিয়ে গিয়ে আরো কি কঠিন র‍্যাগিং দেওয়া হবে এটা ভেবে আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। নিরুপায় হয়ে ভীরু ভীরু পায়ে ১৮৫ নাম্বার রুমে প্রবেশ করলাম।

রুম ভর্তি প্রায় আঠার-বিশ জন সিনিয়র। আমরা তিনজন ও আরো দুইজন অন্য নতুন মেম্বার। মোট পাঁচজন আমরা সেই আঠার-বিশ জনের খেলার পুতুল। তারা আমাদের নিয়ে খেলবে, হেনস্থা করবে। আমরা সবাই লাইন ধরে দাঁড়ালাম। সবার প্রথমে ছিল সঞ্জয়। ও হিন্দু হওয়ায় ওকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হলো। ওকে বলা হলো, তোমাকে বেশি কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমাদের সিনিয়রদের জন্য বাইরে থেকে এক প্যাকেট করে চারমিনার সিগারেট কিনে নিয়ে আসো।

মোট দশ প্যাকেট সিগারেটের হিসাব দিল ওরা। ও বলল যে ওর কাছে দশ প্যাকেট সিগারেট কেনার মতো রুপি নেই। সঞ্জয় নিজেও সিগারেট খেতো না। এটা জেনে তখন ওরা সঞ্জয়কে আরেকটু কনসিডার করে বলল দশ প্যাকেট লাগবে না। তুমি পাঁচ প্যাকেটই বরং নিয়ে আসো। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এর আগে আমাদের সাথে একটানা দুইটা সিগারেট শেষ করতে হবে।

সঞ্জয়কে দুইটা সিগারেট দেওয়া হলো। যারা কখনো সিগারেট খায়নি তাদের পক্ষে একটানা দুইটা সিগারেট খাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য কাজই বটে। অনেক কেশে, চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে ও দুইটা সিগারেট শেষ করল। পরে ওকে সিগারেট কেনার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এরপরের পালা ছিল রুমির। রুমি সম্পর্কে কিছু কথা বলে রাখা ভালো, আমাদের মধ্যে রুমি ছিল সবচেয়ে জেদি, একরোখা স্বভাবের। ও নিজে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাংলাদেশে যখন ছিল বেশ দাপটের সাথে চলাফেরা করত। ওর বাবা-মা কেবল সঙ্গদোষ এড়াতে ওকে এখানে পড়ালেখার জন্য পাঠিয়েছে। তো র‍্যাগিং এ রুমিকে যেটাই করতে বলা হতো, ও গোয়ার্তুমি করত। এতে সিনিয়ররা আরো বেশি রেগে যেত। এবারেও তাই হলো। ওকে প্রথম কাজে না বলায় ওর শার্ট খুলে ফেলা হলো। পরের কাজে না বলায় প্যান্ট খুলে ফেলা হলো। এভাবে একে একে ওর গা থেকে সমস্ত পোশাক খুলে নিয়ে পুরোপুরি বিবস্ত্র করে ফেলা হলো। শাস্তি এখানেই শেষ নয়। এরপর ওকে বিবস্ত্র অবস্থাতেই সেসময়কার একটা জনপ্রিয় তামিল গান "Mustafa Mustafa Don't Worry Mustafa" গানের সাথে নাচতে বলা হলো। সেসময় রুমি অনেকবার অনেক সিনিয়রের হাতে পায়ে ধরেছিল ওকে ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু কেউই ওকে ছাড়েনি। ওকে তাদের কথা মতো বিবস্ত্র অবস্থায় সেই গানের সাথে নাচতে হয়েছিল। ওর চোখ দিয়ে তখন টপটপ পানি পড়ছিল।

এরপরে এলো আমার পালা। আমাকে বলা হলো ওদেরকে গান, অভিনয়, নাচ, বা কোনকিছু করে দেখাতে। আমি বললাম যে আমি আসলে তেমন ভালো করে কিছু পারি না। তখন ওরা আমাকে দেওয়ালে থাকা দুইটা নায়িকার ছবিতে পাঁচবার করে চুমু খেতে বলল। দেওয়ালে মনিষা কৈরালা এবং মমতা কুলকারনির দুইটা ছবি টানানো ছিল।

বিপত্তি হচ্ছে ছবি দুটো আমার উচ্চতার চেয়ে প্রায় এক ফুট উপরে টানানো ছিল আর ছবির গায়ে সাদা পাউডার আর রং লাগানো ছিল।

আমার দুই হাত পেছন থেকে বেঁধে দেওয়া হলো। আমাকে লাফিয়ে লাফিয়ে পোস্টারে নায়িকার গাল বরাবর চুমু খেতে হচ্ছিল। হাত পেছনে বাঁধা থাকায় আমি লাফানোর সময় শরীরের ব্যালেন্স রাখতে পারছিলাম না। প্রতিবার চুমু দেবার সময় আমার নাকে এবং ঠোঁটে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছিলাম। আর ছবিতে থাকা রং আর পাউডার আমার সারা মুখে মেখে যাচ্ছিল। ঠিক ভাবে ৭-৮ বার চুমু খেতে আমার প্রায় ১৫-২০ মিনিট লেগেছিল। ততক্ষণে আমার নাক থেকে রক্ত পরতে শুরু করছিল। রক্ত, রং আর পাউডার মিলে আমার সারা মুখ বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে ওদের মধ্যে থেকে একজন হয়তো মায়াবশত আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল। আমি রক্তাক্ত মুখ নিয়ে রুমে ফিরে আসি।

ডাইনিং এ র‍্যাগিং

আমাদের আরেকটা র‍্যাগিং এর জায়গা ছিল ক্যান্টিন রুম। ডাইনিং এ রান্না হওয়া অধিকাংশ তামিল খাবারই আমরা বাঙালিরা খেতে পারতাম না। কেবল মুরগি আর মাছ কোন ভাবে খেতে পারতাম। আমরা নতুনরা খেতে বসলে বেশিরভাগ সময় সিনিয়ররা এসে খাবারে লবণ ঢেলে দিত, মাছ বা মুরগির পিস নিয়ে নিতো কিংবা ফেলে দিত। অধিকাংশ সময়ই আমাদের খাবার মতো কিছু থাকতো না। আমরা শুধুমাত্র ঝোল দিয়ে কোনরকম পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতাম। জুনিয়রদের সাথে এতো যে অনাচার এসব যে ওখানকার গার্ড, সুপারিটেন্ডরা জানতো না সেরকম না। তারা সবই দেখতো, সবই জানতো। কিন্তু কিছুই বলতো না। প্রশাসনের সামনেই ওরা এসব অন্যায় অত্যাচারগুলো করতো।

খাবারের জন্য সেসময় আমাকে অনেক কষ্ট করতে হতো। আমি খুব সামান্য অর্থ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলাম। হোস্টেলের খাবার পছন্দ না হলে কিংবা র‍্যাগিং এ খাবার কেড়ে নিলে যে বাইরে থেকে কিছু কিনে খাবো সেই সামর্থ্য আমার ছিল না। আমার এমনও অনেকদিন গিয়েছে আমি সারাদিনে মাত্র দুইবেলা খেয়েছি। ওদের

খাবারের মধ্যে দোসা আমি কিছুটা ভালো খেতে পারতাম। আমাদের দেশের বিরাট আকারের যে দোসা পাওয়া যায়, ও দেশের দোসা সেরকম নয়। আকারে বেশ ছোট, অনেকটা চাপটির মতো সাইজ ওদের দোসা।

সকালে আমাদের দোসা খেতে দেওয়া হতো। আমি সেসময় একটা-দুইটা দোসা সাথে করে নিয়ে আসতাম রুমে। যদি কখনও দুপুরে খাওয়া না হয় বা কোন সমস্যা হয় তাহলে সেই দোসা খেয়ে পেটের ক্ষুধা তাড়াতাম। এভাবে খেয়ে না খেয়ে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেসময় আমার ওজন প্রায় তিন চার কেজি কমে গিয়েছিল।

নিজেদের রুমে র‍্যাগিং

হোস্টেলে থাকতে আরেকটা বড় র‍্যাগিং হতো নিজেদের রুমে। সিনিয়ররা গিয়ে জুনিয়রদের বিছানায় পানি ঢেলে ভিজিয়ে আসতো, প্রশ্রাব করে দিত, বিছানার জিনিসপাতি উলটাপালটা করে রেখে আসতো, বালিশ নিয়ে যেত। এ অবস্থায় সারারাত বসে থেকে বা পাশের জনের সাথে চাপাচাপি করে বিছানা শেয়ার করে পরেরদিন তোষক, চাদর ধুয়ে রোদে শুকাতে হতো। এমনও হতো রাতের বেলা লেপ কিংবা কম্বলে ওরা পানি ঢেলে দিত। কি যে অবর্ণনীয় কষ্ট হতো এর ভুক্তভোগীদের তা বোঝানো যাবে না।

ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং

আমরা হোস্টেলে উঠার পাঁচদিন পর আমাদের ক্যাম্পাস খুলে। ক্যাম্পাসে এসে শুরু হয় আরেক ধরনের র‍্যাগিং। হোস্টেলের র‍্যাগিং থেকে ক্যাম্পাসের র‍্যাগিং আলাদা রকম হয়। ক্যাম্পাসে কর্তৃপক্ষের নজরদারি থাকায় বেশি কিছু করতে পারত না। সিনিয়র গ্রুপ নতুনদের ডেকে পাঠাতো। নতুনরা এসে কাচুমাচু হয়ে আসতো। একটা না একটা দোষ ধরতোই। নমস্কার দেয়নি কেন, শার্ট এভাবে পড়েছো কেন, চোখে সানগ্লাস পড়েছো কেন, হাতা গুটিয়েছো কেন, এরকম

হাজারো অভিযোগ। ক্যাম্পাসের একটি কমন র‍্যাগিং ছিল নতুনদের পায়ের জুতা খুলিয়ে জুতা বগলে নিয়ে হাঁটানো। ডেকে বলতো, এই ছেলে তুমি তো চরম বেয়াদব। সিনিয়রদের সামনে জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটছো। এখনই জুতা খুলো বলছি। জুতা হাতে নাও। বগলে চেপে পুরো ক্যাম্পাস একবার চক্কর দিয়ে আসো। আমার নিজেকেও কয়েকবার এরকম জুতা বগলে চেপে ক্যাম্পাসে রাউন্ড দিতে হয়েছে।

আরেক রকম র‍্যাগিং হতো, কাগজে I am stupid/ Hit me / I am a fool /Slap on my ass এরকম আজে বাজে কথা লিখে জুনিয়রদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হতো। কিংবা কাগজ দিয়ে লেজের মতো বানিয়ে প্যান্টের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হতো। ভুল করেও সেটা খুলা যাবে না। ঐ লেখা পিছনে নিয়েই ক্যাম্পাসে ঘুরতে হবে।

আরেকটি র‍্যাগিং ছিল, জুনিয়রদের দিয়ে সিনিয়র আপুদের প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ানো। বলা হতো নির্দিষ্ট কোন মেয়েকে গিয়ে প্রেমের প্রপোজাল দিতে হবে। যে ভাবেই হোক তাকে প্রেমে রাজি করাতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই মেয়ে হ্যাঁ বলে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে I Love You বলে যেতেই হবে। পুরো ব্যাপারটা কিন্তু করতে হতো সবার সামনে। চুপিচুপি কথা বলার কোন সুযোগ নেই।

এটা করতে গিয়ে জুনিয়ররা খুব বিব্রত হতো। চিনে না, জানে না, বড় একটা মেয়েকে গিয়ে I Love You বলাটা শুনতে যতোটা সহজ আর মজার মনে হয় আসলে ব্যাপারটা ততটা সহজ না। বিশেষ করে লাজুক ছেলেদের কাছে এটা অন্যসব কঠিন র‍্যাগিং এর চাইতেও বেশি কঠিন লাগতো। সিনিয়র মেয়েরা এই ব্যাপারগুলো ভালো করেই জানতো। ওরাও সেই জুনিয়র ছেলেদের সাথে মজা নিতো। কেউ বলতো আমাকে একটা সুন্দর গান গেয়ে শোনাও তাহলে রাজি হবো, কেউ বলতো অভিনয় করে দেখাও, কেউ বলতো আরো সুন্দর করে রোমান্টিক ভাবে প্রোপোজ করতে, কেউ বলতো ফুল নিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে প্রপোজ করতে, কেউ বলতো দুইটা ফিল্মি ডায়লগ দিয়ে প্রপোজ করতে, এরকম নানা কথা। কিছু মেয়েরা সহজেই ছেড়ে দিতে চাইতো। ওরা বলতো, হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে যাও। কিছু মেয়ে আবার অনেক ঘুরাতো।

আমি টুকটাক গান গাইতে পছন্দ করতাম। এটা ক্যাম্পাসের অনেকেই জানতো। এই গানের জন্য আমি অনেক র‍্যাগিং থেকে বেঁচে গেছি। বড় ভাইয়েরা ডেকে বলতো, এই মিরাজ একটা হিন্দী গান শোনাওতো। আমাকে কোন কিছু করতে বললে আমি সাধারণত ওদেরকে রাগানোর চেষ্টা করতাম না। যা বলতো শুনতাম। আমাকে গান গাইতে বললে আমি গান গাইতাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গাওয়া হতো Dil Mera Churay Kyun গানটা। কোনভাবে এটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে আমি এই গানটা ভালো গাই। এরপর হোস্টেলে এবং ক্যাম্পাসে অনেকবার আমাকে এই গান গাইতে হয়েছে। আরেকটা গান ছিল Mere Rang Mein Rangne Wali ওটাও বেশ পপুলার হয়েছিল ক্যাম্পাসে আমার গলায়। এরপর একটা সময় আসলো, ক্যাম্পাসে কিংবা হোস্টেলে গান গাওয়ার কথা উঠলেই আমার ডাক পড়তো। ওটাই ছিল আমার জন্য র‍্যাগিং। তবে মিষ্টি র‍্যাগিং।

রুমির র‍্যাগিং

আগেই বলেছি আমাদের মধ্যে রুমি ছিল সবচেয়ে জেদি। বিভিন্ন সিনিয়র গ্রুপের সাথে র‍্যাগিং এ ও গোয়ার্তুমি করেছিল। একবার এক সিনিয়র ক্ষেপে গিয়ে ওকে শাস্তি দেবার জন্য আমাদের হোস্টেল থেকে প্রায় ১৮-২০ কিলোমিটার দূরে গোল্ডেন বীচ নামে জনবিচ্ছিন্ন একটা জায়গায় রাতের বেলা ওকে বাইকে করে রেখে আসে। ওটা এমনই জনবিচ্ছিন্ন, আশে পাশে কোন মানুষ, দোকান-পাট, লোকালয় কিছুই নেই। সেখানে সারা রাত ওকে একা একা থাকতে হয়। পরদিন ভোরে হেঁটে হেঁটে দুপুর বেলায় হোস্টেলে পৌঁছায়।

র‍্যাগিং-এর শিকার হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

র‍্যাগিং এর শিকার এক শিক্ষার্থী যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ক্যাম্পাসের ৪ তলা বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো হওয়ায় সে প্রাণে বেঁচে যায়। আমাদের

ক্যাম্পাসের চারপাশের মেঝে কংক্রিট করা ছিল না। চারিদিকে বালু ছিল। তাই সেই ছেলেটা প্রাণে বেঁচে যায় কিন্তু ওর হাঁটু-হাত ভেঙ্গে যায়।

এই ঘটনার পর ক্যাম্পাসে বেশ আলোড়ন তৈরি হয়। ক্যাম্পাস অথরিটি র‍্যাগিং এর ব্যাপারে কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে। এরপর ধীরে ধীরে র‍্যাগিং এর পরিমাণ কমে যেতে থাকে।

র‍্যাগিং এর সমাপ্তি

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে র‍্যাগিং এর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘটনা হচ্ছে, র‍্যাগিং এর কারণে ভারতীয় এক ছেলের মৃত্যু। হোস্টেলে কিছু কিছু রুমে ইলেক্ট্রিক হিটার ব্যবহার হতো। মাঝে মাঝে নিজেরা রান্না করে খাওয়ার জন্য এই হিটার ব্যবহার করত। যদিও এটা হোটেলে নিষিদ্ধ ছিল।

একবার ভারতীয় এক ছেলেকে হোস্টেলে রুমের মধ্যে র‍্যাগিং দেওয়া হচ্ছিল। র‍্যাগিং এর এক পর্যায়ে ছেলেটিকে চলন্ত হিটারে প্রশ্রাব করতে বাধ্য করানো হয়। এই ঘটনায় ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে ছেলেটা মারাত্মক ভাবে আহত হয়। ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছেলেটি মারা যায়।

এই ঘটনার পর হোস্টেল এবং ক্যাম্পাসে ব্যাপক আন্দোলন হয়। কর্তৃপক্ষ চরম সমালোচনার শিকার হয়। দোষী শিক্ষার্থীদের ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আর এর পর থেকে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে র‍্যাগিং প্রথা উঠে যায়। সমাপ্তি হয় এক কালো অধ্যায়ের।

প্রথম জন্মদিন উদযাপন

অনেকেই ভাবতে পারেন এটাতো খুবই কমন একটা ব্যাপার আমাদের জীবনে। মা বাবা জন্মের প্রথম বছরেই সন্তানের ঘটা করে জন্মদিন পালন করে থাকে। কিন্তু যে ব্যাপারটা আনকমন সেটা হলো, আমার প্রথম জন্মদিন উদযাপিত হয় আঠারো বছর বয়সে। ভাবছেন দিনক্ষণের কোন জটিলতা কিংবা লিপ ইয়ারের মতো কোন বিষয়। না! একদমই সেরকম না। আমি আসলে যেই পরিবারের বেড়ে উঠেছি সেখানে সন্তানদের জন্মদিন পালন করা বিরাট বড় বিলাসিতা। আমি আগেই বলেছি আমার জন্ম হয় এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। বাবা-মা অতি কষ্টে আমাদের বড় করেছেন। তিনবেলা খাওয়াই তখন আমাদের জুটত না, তাই জন্মদিন পালনের মতো বাহুল্য আয়োজন আমাদের জীবনে ছিল না। তাছাড়া অনেকগুলো ভাই-বোন থাকায় কখন কার জন্মদিন এলো-গেলো এসব কারো খেয়ালেও ছিল না।

আমি ছোটবেলা থেকেই দেখতাম বন্ধুদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলো। নতুন জামা পড়ে, বিরাট বড় কেক সামনে নিয়ে, বাহারি রঙের বেলুন ফুলিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান উদযাপন করত। ভালো খাওয়ার আয়োজন করা হতো। সবাই হাতে করে বিভিন্ন উপহার নিয়ে আসতো। খেলনা, পুতুল, গাড়ি, প্লেন, বল সহ কতো কতো সুন্দর সুন্দর উপহার। সেসব দেখে কখনো কি আফসোস হতো? আজ অনেক বছর পর অতীতের অনুভূতি গুলোকে বিচার করে বুঝতে পারি, নাহ! আফসোস কখনো হতো না। নিজের পরিবারের অবস্থা আমি বুঝতে পারতাম। সাধ্যের বাইরের কোন কিছুর জন্য প্রত্যাশা আমাকে স্পর্শ করত না। তাই অন্যের জন্মদিনের অনুষ্ঠান দেখে আফসোস হতো না। কিন্তু খুব ভালো লাগতো দেখতে।

আমি যখন ১৭ বসন্ত অতিক্রম করে ১৮ বসন্তে পা রাখি তখন আমার জীবনের প্রথম জন্মদিন উদযাপিত হয়। সে সময় আমি গ্রাজুয়েশনের

জন্য মাদ্রাজে (অধুনা তামিলনাড়ু) থাকি। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ালেখা করি। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে থাকি। হোস্টেলের জীবন খুবই বৈচিত্রময়। যারা কখনো হোস্টেলে থাকেননি তারা এর অভিজ্ঞতা বুঝবেন না। যখন কেউ বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে হোস্টেলে যায় তখন সে নতুন অনেক কিছু শিখতে পারে। নতুন বন্ধু পায়, নিজের কাজগুলো নিজের মত করতে পারে, নিজের দায়িত্ব নিতে শিখে, স্বাধীন ভাবে থাকে। সেখানে বিভিন্ন সমস্যা, পরাজয়, হতাশা ও হৃদয়ভাঙ্গার মত বিষয়গুলোর মুখোমুখি হলে নিজেই সমাধান করতে হয়। এছাড়া হোম সিকনেস ব্যাধিটা তখন খুব করে চেপে বসে। হোস্টেলে থাকার সময় বন্ধুদের সাথে আনন্দময় সময় যেমন কাটে তেমনি বন্ধুত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি, দলাদলি, মারামারি, র‍্যাগিং, এর মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে।

মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সোহেল। আমার জন্মদিনের মাস খানেক আগে ছিল সোহেলের জন্মদিন। আমরা সবাই অনেক হই-হুল্লোড় করে হোস্টেলে ওর জন্মদিন পালন করেছিলাম। খুব আনন্দ হয়েছিল আমাদের। সেদিন সোহেল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার জন্মদিন কবে। আমি ওকে সত্যিটাই বলেছিলাম যে আমার কখনও জন্মদিন পালন করা হয়নি। জন্মদিন পালনের অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন আমি জানিনা। কিন্তু অন্যদের জন্মদিনের অনুষ্ঠান দেখতে বেশ ভালই লাগে।

সম্ভবত এই কথাটা ওর মাধ্যমে ভার্সিটি এবং হোস্টেলে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে আমি এত বছর বয়সে কখনো জন্মদিন পালন করিনি। তাই হয়তো সব বন্ধু-বান্ধব, ক্লাসমেটরা মিলে উদ্যোগ নিয়েছিল আমার জন্মদিন আসলে সবাই মিলে উদযাপন করবে। এর অবশ্য কিছুই তখন আমার জানা ছিল না।

হাঁটি-হাঁটি পা পা করে আমার জন্মদিন ঘনিয়ে এল। ২৫শে অক্টোবর, ১৯৯৬। পরদিন আমার জন্মদিন। সারাদিন আর দশটা সাধারণ দিনের মতোই কেটেছে। ক্লাস করেছি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েছি, ক্যাফেটেরিয়াতে খেয়েছি, বিকালে মাঠে খেলেছি, সন্ধ্যায় গ্রুপ স্টাডি

করেছি। সবকিছু সাধারণ ছিল। আগামীকাল আমার জন্মদিন। এটা নিয়ে আমার কোন ভাবনা ছিল না। অন্যসব বছরের মতোই কেটে যাবে এই দিন, এরকমই ভাবনা ছিল।

রাত দশটা। হোস্টেলের দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে শুরু করল। রুমমেট এবং বন্ধুদের মধ্যে কেমন যেন এক লুকোচুরি ব্যাপার। ওরা কিছু যেন একটা করছে কিন্তু কি করছে বুঝতে পারছি না। কেবল রহস্য ছড়াচ্ছে। ওদের জিজ্ঞেস করলেও তেমন উত্তর দিল না। আমিও তেমন কিছু না ভেবে শুয়ে ছিলাম। রাত সাড়ে এগারোটা। রুমমেটরা এখনো বাইরে। কিছুক্ষণ পর আমি বাইরে এসে দেখি হোস্টেলের সব ছেলেরাই প্রায় বাইরে। হোস্টেলে এত রাতে সাধারণত কেউ বাইরে থাকে না। আমি বেশ অবাক হলাম। কিছুক্ষণ পর আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল। বন্ধু নিচে চল, চল না। আরে আয়। বলে আমাকে প্রায় কোলে তুলে দোতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনলো। আমাদের হোস্টেল গ্রাউন্ডে ছোট খাটো একটা মাঠ আছে যেখানে আমরা ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এসব খেলতাম। জায়গাটা রাতের বেলা বেশ অন্ধকার থাকতো কারণ ওখানে আলাদা করে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ব্যালকনির লাইটে যতটুকু আলো হয় ততোটুকুই। ওরা আমাকে তুলে সেই মাঠে নিয়ে আসল। নিচে এসে দেখি হোস্টেলের সব ছেলেরাই ওখানে জমায়েত হয়ে আছে। আমি এসে দাঁড়াতেই অন্ধকার জায়গাটা হঠাৎই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। চোখ ধাঁধানো আলোর ফোয়ারায় চারিদিক মনে হলো দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমি তখন এতটাই অবাক আর হতভম্ব হয়ে গেলাম যে কি হচ্ছে কাউকে জিজ্ঞেস ও করতে পারছিলাম না।
আলোটা কিছুক্ষণ পর চোখে সয়ে আসলে দেখলাম আমার সামনে বড় একটা টেবিল সাজানো। তার উপর বিরাট এক কেক। চারপাশে বাহারি রঙের বেলুন, হাতে হাতে ফোম স্প্রে, চুমকি ও আতশবাজি। অবাক করা বিষয় সেখানে আমাদের হোস্টেলের প্রক্টর এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও উপস্থিত। সবাই অত্যন্ত হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখনো বুঝতে পারিনি কি হচ্ছে আজ। ঘড়ির কাঁটা বারোটা স্পর্শ করল, সবাই আমাকে ধরে টেবিলের কাছে কেকের সামনে নিয়ে

গেল। চারদিকে বুম বুম শব্দে আতশবাজি ফুটতে লাগল, সবার গায়ে চুমকি ছিটিয়ে দেওয়া হলো। এরপর সবাই একসাথে গাইতে শুরু করল, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার মিরাজ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।

আমার প্রথম জন্মদিন উদযাপন হলো। ঘরোয়া নয় বরং ঘটা করেই উদযাপিত হলো। সেসময়টা আমি যেন এক ঘোরের মধ্যে ভাসছিলাম। কি হচ্ছে, আসলেই কি হচ্ছে, আমার জন্যই কি হচ্ছে, উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। এতো বছরের না পাওয়া আনন্দ হাতে পেয়ে আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। অঝোর ধারায় আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বন্ধুরা তখন আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল। আমার এক জনমের এক অপার পাওয়া এই বন্ধু গুলো। আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই এই প্রাপ্তির জন্য।

আমার সেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এমন সব ছেলেরাও ছিল যাদের সাথে আমার কখনো কথাই হয়নি। ওরা আমার বন্ধু না, সহপাঠি না, এক দেশের না, এক ধর্মেরও না। তবুও ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার জন্মদিনে অংশগ্রহণ করেছে। আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমি আজও জানিনা কেন ওরা আমার জন্য এতো আয়োজন করছিল, কেন এতোটা পছন্দ করেছিল আমায়। বাংলাদেশিদের প্রতি এরকম ভ্রাতৃত্ববোধ আমি আগে কখনো দেখিনি। এটা নিঃসন্দেহে আমার জন্য পরম পাওয়া।
শুধু শুভেচ্ছাই নয়, সবাই আমাকে অনেক অনেক গিফটও দিয়েছিল। এতো পরিমাণ গিফট আমি এখন পর্যন্ত আর পাইনি। সবাই তাদের সাধ্যের মধ্যে বিভিন্ন কিছু উপহার দিয়ে আমার প্রথম জন্মদিনকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। কেউ টি-শার্ট, কেউ জিন্স, কেউ পাঞ্জাবি, কেউ শার্ট, কেউ কেডস, কেউ রিস্টওয়াচ, কেউ ক্যাপ, এরকম কত উপহার যে ছিল! একজন আমাকে তামিলদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক সাদা ধুতি-শার্টও উপহার দিয়েছিল। যেটা পরবর্তীতে সবার আবদারে আমাকে পরে ছবিও তুলতে হয়েছে। এছাড়া হোস্টেলের প্রক্টর এবং সুপারিনটেন্ডেন্টও আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গিফট দিয়েছিল। সবার

এতো এতো ভালোবাসায় আমি চিরমুগ্ধ হয়ে ছিলাম। এতো এতো মানুষের সিক্ত শুভেচ্ছায় কাটানো আমার প্রথম জন্মদিন আমার কখনো ভুলবার নয়। সে রাতে আমার আর ঘুমানো হয়নি।

পরদিন ক্লাসে গিয়ে বুঝলাম আমার জন্য আরো সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। প্রথম ক্লাস ছিল মালা ম্যাড্যামের বিজনেস স্টাডিজ। মালা ম্যাডাম আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার প্রতি মালা ম্যাডামের অনুগ্রহের একটা ঘটনা বলি। উনার ক্লাসে আমাদের কিছু ম্যাথ করতে হতো। সেসময় আমার সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ছিল না। মালা ম্যাডাম আমাকে একটি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর গিফট করেছিলেন। তো আমার জন্মদিনের দিন ক্লাসেও জন্মদিনের একটা পার্টি হয়েছিল। ম্যডাম নিজে সেই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে ক্লাসে আমার সেই জন্মদিনের প্রোগ্রামে আমাদের ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর স্যারও এসেছিলেন। উনি আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছেন। সেদিন ঐ ক্লাস আর আমাদের করা হয়নি। হই-হুল্লোড়, রং ছিটাছিটি, মিষ্টি মাখামাখি আর নানান মজায় আমাদের সেই ক্লাস শেষ হয়েছে। এত বছর যে আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলাম, সৃষ্টিকর্তা তার সবটুকু আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনাগুলোর মধ্যে তাই এই জন্মদিনের অনুষ্ঠান এক বিরাট স্থান দখল করে আছে।

কবরস্থানে এক বিভীষিকাময় রাত

মানুষের জীবনের অন্যতম বড় সত্য হচ্ছে মৃত্যু। যে জন্ম নিয়েছে সে মারা যাবে। এই সহজ সত্যটাকে আমরা অধিকাংশ মানুষই সহজে মেনে নিতে পারি না। যেই জীবন্ত মানুষটার সাথে অনেক দিন আড্ডা গল্প করে কেটেছে সে লোকটা মরে গেলেই সে হয়ে উঠে এক ভয়ংকর বস্তু। সচল জীবন্ত মানুষের চেয়ে নিশ্চল মৃত মানুষকে মানুষ বেশি ভয় পায়। আর মৃতদের বাসস্থান কবর। কবরের আশেপাশে দিয়ে চলাচল করতে অনেকের গা ছমছম করে। যদি কখনো পরিস্থিতি এমন হয়, এক রাত একা নির্জীব কবরস্থানে কাটতে হবে তাহলে তার অনুভূতি কি রকম হবে? আমার জীবনে এসেছিল তেমন এক পরিস্থিতি। সারারাত মনুষ্যহীন অন্ধকার করবরস্থানে কাটিয়েছি। একা! একা!

সময়টা ১৯৯৭ সাল। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশন চলছে তখন আমার। ছুটিতে কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে এসেছি। অনেকদিন পর বাংলাদেশে ফিরে প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সবার সাথে দেখা সাক্ষাত হলো। আমরা বন্ধুরা ঠিক এরকম যে অনেক বছরও যদি আমাদের যোগাযোগ না হয়, যেদিন আমাদের দেখা হবে সেদিন আমরা ঠিক এমনভাবে মিশি, কথা বলি যেন গতকালও আমাদের দেখা হয়েছে। ছুটিতে বন্ধুরা সবাই মিলে ঠিক করলাম রাঙামাটি ঘুরতে যাব।

পাহাড়, ঝর্না আর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙ্গামাটি। কাপ্তাই লেকের বুকে ভেসে থাকা ছোট্ট এক জেলা শহর আর আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বৈচিত্র্যময় স্থান। বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজে রাঙামাটির প্রকৃতি। রাঙামাটি এর আগে আমার যাওয়া হয়নি। তাই রাঙামাটি যাবার পরিকল্পনায় আমার

বেশ উৎসাহ ছিল। সবাই প্ল্যান করে দিন-ক্ষণ ঠিক করে ৬ বন্ধু মিলে রওনা দিলাম রাঙামাটির উদ্দেশ্যে।

সেসময় এখনকার মতো ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। রাঙামাটির সরাসরি বাস ছিল না। ভেঙে ভেঙে যেতে হতো। রাস্তা ছিল ভিষণ ভাঙ্গাচুরা। আর ভালো মানের বাস ও ছিল না। অনেক সময় লাগতো ঢাকা থেকে রাঙামাটি পৌঁছাতে। বয়সে তরুণ ছিলাম আর ভেতরে উচ্ছ্বাস এত বেশি ছিল যে এসব আমাদের কাছে কোন ব্যাপারই মনে হয়নি। প্রায় ১৬ ঘণ্টা জার্নি করে সকাল বেলা আমরা রাঙামাটি পৌঁছালাম।

রাঙামাটি পৌঁছে চারপাশের সবুজের সমারোহে আমরা বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। অনন্তকাল ধরে প্রকৃতির সাথে মানুষের বসবাস। প্রকৃতি মানুষকে অন্ন দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে, বেঁচে থাকার রসদ দিয়েছে। প্রকৃতির মাঝে গেলে তাই মানুষ স্বস্তি পায়, শান্তি পায়, মনের এবং দেহের। দীর্ঘদিন ইট-কাঠের চারদেয়ালে বন্দী থাকার পর হঠাৎ চারিপাশে এত সবুজ দেখে তাই আমরা সবাই বিমোহিত হয়ে গেলাম।

অনেক বড় বড় পাহাড়, গাছ, ছোট ছোট টিলা, পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেত, জুমচাষ পদ্ধতিতে ধান, কলা, পেপে, আদা, হলুদ, আনারসের বাগান আরো কতো কি! আমাদের ছয়জনের মধ্যে একজন এর আগে বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে। এখানকার রাস্তাঘাট, দর্শনীয় জায়গা, স্থানীয় লোকদের সাথে ওর জানা শোনা ছিল। ওই আমাদের গাইড করছিল।

সেসময় পাহাড়ে শান্তি বাহিনীর একটা ইস্যু ছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাম্পও ছিল কয়েক জায়গায়। কিছু জায়গা আছে যেখানে ওখানকার উপজাতিরা বাঙালিদের প্রবেশ পছন্দ করত না। সেদিকে ঘুরতে গেলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে পারমিশন নেবার প্রয়োজন পড়তো। আমরা সবাই সেসময় স্টুডেন্টস। পারমিশনের ঝামেলা এড়ানোর জন্য আমাদেরকে বিকল্প গোপন পথ বেছে নিলাম। স্বাভাবিকভাবেই সেই পথ বেশ দুর্গম।

আমাদের সাথে কিছু খাবার ছিল। সবাই সেগুলো দিয়ে সকালের নাস্তা করে বেলা এগারোটার দিকে রওনা হলাম সেই দুর্গম পথ ধরে। আমাদের সাথে তাঁবু টানানোর সরঞ্জামাদি, সবার একটা করে পার্সোনাল ব্যাগ, আর খাবারের ব্যাগ ছিল। আমরা স্থানীয় একজন মংকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ট্র্যাকিং করার পথে দেখতে পেলাম রাস্তার পাশে কলা বাগান। ইচ্ছা হলে নিজেরাই ছিঁড়ে খাওয়া যায়। আরও রয়েছে পাকা পেঁপের বাগান। পাকা পেঁপের হলুদ রঙে পুরো জায়গাটা হলুদময় হয়ে আছে। পাখি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে পেঁপে। আমরা এসব খুব উপভোগ করছিলাম। যাত্রা পথে কিছু পশু পাখির দেখা মিললো যেগুলো সচরাচর আমরা খুব একটা দেখতে পাই না। কিছু অচেনা পাখি, বন্য শূকর, কাঠবিড়ালি, বানর, এরকম অনেক অনেক প্রাণী।

জঙ্গলে সন্ধ্যা নেমে আসে খুব দ্রুত। সূর্যের আলো বড় বড় গাছের আড়ালে হারিয়ে যায়। ব্যাপারটা আমাদের আগে খেয়ালে ছিল না। সূর্যের আলো হঠাৎই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় আমরা একটা পাহাড় বেয়ে উঠছিলাম। আমার ধারণা সেটা ভূমি থেকে প্রায় চারশ ফিট উপরে হবে। আমরা ঠিক করলাম ওখানে ফায়ারিং করব। আমাদের সাথে থাকা মং আমাদেরকে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল ফায়ারিং এর জন্য। বলল এই জায়গাটা তুলনামূলক নিরাপদ। ঘণ্টা দুই-একের জন্য এখানে ফায়ারিং করলে আশেপাশের সেনাবাহিনী বা উপজাতিদের নজরে পড়বে না।

আমরা আগুন জালালাম। সাথে থাকা খাবারের আইটেম রান্না হচ্ছিল। আমি আর আমার এক বন্ধু তৌহিদ ভাবলাম আশ-পাশটা একটু দেখে আসি। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা ভেতরে চলে গেলাম। হঠাৎ দূরে আমি একটা অদ্ভুত ফুল দেখতে পেলাম। ভিন্ন রকমের একটা ফুল, এমন ফুল এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমার মনে হলো কাছে গিয়ে ফুলটাকে ভালো করে দেখি। আমি আমার বন্ধু তৌহিদকে দেখালাম ফুলটা। ও তখন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ও বলল, আমি সিগারেটটা শেষ করি। তুই বরং গিয়ে দেখে আয়। আমি একাই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে একদল বন্য খরগোস

দৌড়ে পালালো। কিছুটা সামনে এগিয়ে চিনা মুরগির মতো অদ্ভুত আরেকটা প্রাণী দেখতে পেলাম। ওটাকে দেখার জন্য আরো কিছুটা এগিয়ে গেলাম। আনমনে আমি সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। কতদূর হেঁটেছি খেয়াল নেই। প্রায় ১০-১৫ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ আমার মনে হলো আমি তৌহিদের কাছ থেকে অনেকদূরে চলে এসেছি। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে। আমি চারপাশে তাকিয়ে কোনদিক দিয়ে এসছি কিছুই চিনতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগল আমি বোধহয় হারিয়ে গেছি। আমি তৌহিদ ও অন্য বন্ধুদেরকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কারও কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছিলাম না। তারমানে আমি ওদের থেকে এতটাই দূরে চলে এসেছি যে আমার ডাক কারও কানে পৌঁছাচ্ছিলো না। ভেতরে ভেতরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম আমি। এলোমেলো আশে পাশে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর এরকম হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে দেখলাম ওখান থেকে নীচে নামার একটা রাস্তা আছে। আমি ভাবলাম এলমেলো না হেঁটে আমি বরং নীচেই নেমে যাই। সেখানে গেলে লোকালয়ের দেখা পাব। ওখান থেকে একটা ব্যবস্থা করতে পারব। আমি ঐ রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলাম। আচমকা আমার পা পিছলে গেল। শরীরের ভারসম্য না রাখতে পেরে আমি নিচের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগলাম। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি গাছপালার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছি। এভাবে কতক্ষণ পড়েছি আমি জানি না, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে আমি লম্বা সময় ধরে গড়িয়ে পড়েছি। এভাবে গড়াতে গড়াতে হঠাৎ কোন শক্ত কিছুর সাথে প্রচণ্ড জোরে আমি ধাক্কা খাই। আমার হাতে, পায়ে এবং মাথায় প্রচণ্ড ব্যাথা পাই। আমি জ্ঞান হারাই।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো আমি অনুভব করলাম আমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যাথা। আমার একটা পা এক জায়গায় কেটে গেছে, রক্ত পরছে। হাতের কনুই ফুলে গেছে, মাথায় এক অংশে ছিলে গেছে। আমি এক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। কোথায় আমি! মাথা ঘোরাচ্ছিলো তখন আমার। আমার গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছিল না। তবুও কষ্ট করে

চিৎকার করলাম, কেউ আছেন? আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে বাঁচান। কেউ শুনতে পাচ্ছেন? কিন্তু কারও কোন সাড়া পেলাম না।
তখন কয়টা বাজে আমি জানি না। আমার হাতে একটা ঘড়ি ছিল। উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ার সময় সেটা হাত থেকে খুলে গেছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ব্যাথায় পা নাড়াতে পারছিলাম না। আমি ভাঙা পা নিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে কিছুদূর সামনে আগানোর পর গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক উপরে চাঁদের একটা অংশ দেখতে পেলাম। ঐ সামান্য আলোই ছিল তখন দেখবার মতো। চারপাশে শুধু গাছ আর গাছ। আশপাশ থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম। খুবই বাজে দুর্গন্ধ। গন্ধে আমার পেট থেকে সব বের হয়ে আসছিল। গন্ধটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্য আমি স্ক্রলিং করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সামান্য আলো ছিল তখন। সামনে আগিয়ে যা দেখলাম তা দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা মরা লাশ।

একটা বীভৎস মরা লাশ। শরীর পচে গেছে। গা থেকে পোকা বের হচ্ছে। ফুলে যাওয়া সেই লাশ থেকে বের হচ্ছে বিকট দুর্গন্ধ। লাশের অবস্থা দেখে মনে হলো সম্ভবত ৮-১০ দিন আগের। অন্ধকার অজানা একটা জায়গায় পচা দুর্গন্ধময় লাশের পাশে আমি! প্রচন্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠি। মনে মনে যতো দোয়া-দুরুদ জানতাম সব পড়তে লাগলাম। আমি ওখান থেকে দৌড়ে পালাতে চাইলাম। কিন্তু ভয়ে আমার শরীর যেন আরও অসাড় হয়ে গেল। ভাঙ্গা পা নিয়ে আমি কোনরকম ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ওখান থেকে দূরে সড়ে আসি। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে হাঁপাতে থাকি। প্রচণ্ড ক্লান্ত। কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানি না। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়ে গেল। এত তৃষ্ণা যেন আমি এখনই একটু পানি না খেতে পেলে বুক ফেটে মারা যাব। কিন্তু এই অন্ধকার জায়গায় কোথায় পানি পাবো! শরীর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আশে পাশে নিরুপায় হয়ে খুঁজতে লাগলাম কোথাও যদি একটু পানি পাওয়া যায়। খানিক দূর যাবার পর দূরে একটা ঢিবির মতো একটা জায়গায় দেখতে পেলাম কিছুটা পানি জমে আছে। কিসের পানি, নোংরা নাকি পরিষ্কার, এই হিসাব তখন আমার নেই। আমার কাছে তখন শুধু মনে হয়েছে আমাকে পানি খেতে হবে। আমি দুই হাতে আঁজলা ভরে পানি

নিয়ে মুখে দিলাম। পানি খাবার পর মনে হলো আমার শরীর এখন কিছুটা ভালো লাগছে।
রাত তখন কয়টা বাজে অনুমান করতে পারব না। মাথার উপর একটু খানি চাঁদ মেঘের সাথে খেলা করছে। এই একটু খানি আলো, একটু পরেই ঘোর অন্ধকার। আমি একটু ভালো জায়গায় যেতে চাইলাম যেখানে দুর্গন্ধ নেই। হেঁচড়ে হেঁচড়ে কষ্ট করে কিছুদূর আগানোর পর এক জায়গায় এসে দেখলাম ওখানে দুর্গন্ধ নেই। বরং কিছুটা সুন্দর গন্ধ নাকে লাগছিল। এতক্ষণ বাজে গন্ধের মধ্যে থেকে হঠাৎ সুগন্ধ পেয়ে খুব ভালো লাগছিল। কোথা থেকে আসছে এই সুগন্ধ! কৌতূহল হলো দেখার জন্য।
সুগন্ধের উৎস খুঁজতে কিছুদূর সামনে আগাতেই দেখি ছোট চারকোণা একটা জায়গা। চারপাশে ছোট ছোট গাছ দিয়ে ঘেরাও করা। গাছগুলো দেখে মনে হলো নতুন লাগানো হয়েছে। আমি সেই চারকোণা জায়গাটার সামনে এগিয়ে গেলাম। ওখানে আরো বেশি সুগন্ধ। আমি ভাবলাম আশে পাশে হয়তো কোন ফুলের গাছ আছে। চারকোণা সেই জায়গায় দেখলাম একটা সাদা কাপড় পড়ে আছে। কিছু অংশ বাইরে আর কিছু অংশ মাটির ভেতরে। আমার এক পা থেকে তখনো রক্ত ঝড়ছিল। আমি ভাবলাম সেই কাপড়টা টেনে পায়ের আঘাতের জায়গাটা বেঁধে দেবো। আমি কাপড়টা ধরে টান দিলাম। কাপড়টা শক্ত হয়ে মাটির নিচে আটকে ছিল। আমি আরো জোরে টান দিতেই কাপড়টা উঠে আসল। এরপর যা দেখলাম তা দেখে আমি আরেকবার ভয়ে জ্ঞান হারালাম।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো জানিনা। জ্ঞান ফিরে দেখি সেই কাপড়ের নীচে ৭-৮ বছর বয়সী একটা ছেলের লাশ। ফুটফুটে চেহারার একটা ছেলে এমন শান্ত ভঙ্গীতে শুয়ে ছিল দেখে মনে হচ্ছিল ছেলেটা মরেনি, ঘুমিয়ে আছে। আমার কেন যেন ছেলেটার মুখ দেখে প্রচণ্ড মায়া লাগছিল। এতো সুন্দর একটা ছেলে! দেহটা এখনো অক্ষত। হয়তো ২-৩ দিন আগে ওর মৃত্যু হয়েছে। সুন্দর গন্ধটা বাচ্চাটার কাছ থেকে আসছে। এ আমি কোথায় এসে পড়লাম! এতো লাশ কেন আশে পাশে! ভয়ে আমি আরেকবার জ্ঞান হারালাম।

এরপর যে কতোবার জ্ঞান হারিয়েছি আর জ্ঞান ফিরে পেয়েছি তার হিসাব আমার জানা নেই। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি মাটিতে নেই। আমি শূন্যে ভাসছি। কখনো ঘুমাচ্ছি, কখনো জাগছি। কখনো ছুটছি, কখনো থামছি। কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে। আমি তার থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছি। আমার সামনে অনেক বড় বিপদ। কিন্তু কে সে? আমি ছুটছি আর ছুটছি। আর আমার কানে যেন কোন এক শিশুর কণ্ঠ বাজছিল, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার কোন ভয় নেই। আমার মাথার মধ্যে কিসব যে হচ্ছিল তা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। প্রচণ্ড ভয় আর আতঙ্কে আমি যেন অপ্রাকৃতিক সব শব্দ শুনছিলাম আর উদ্ভট উদ্ভট সব জিনিস দেখছিলাম। এভাবে বার বার জ্ঞান হারাচ্ছিলাম।

কিভাবে সেই রাত কেটেছে আমি জানি না। সকালে যখন চেতনা হলো তখন শুনতে পেলাম দূরে কারা যেন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। তখন আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাদের চিৎকার দিয়ে ডাকলাম। দুইজন লোক আমার চিৎকার শুনে দৌড়ে আমার কাছে ছুটে আসল।

ওরা আমাকে ওদের ভাষায় কিসব জিজ্ঞেস করছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না। মনে হলো হয়তো জিজ্ঞেস করছে আমি এখানে কিভাবে এলাম। আমি ওদেরকে ইশারা ইঙ্গিতে বোঝালাম বন্ধুদের সাথে ঘুরতে এসে গতকাল সন্ধ্যায় আমি পাহাড় থেকে এখানে গড়িয়ে পড়েছি। ওরা তখন আমাকে বোঝালো কিছুটা দূরে একটা ক্যাম্প আছে। আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। আমি তখনো হাঁটতে পারছিলাম না। ওরা আমার পায়ে একটা লাঠি জোড়া দিয়ে আমাকে ধরে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

ক্যাম্পে যাবার পর ওখানকার ডাক্তার আমাকে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিল। কিছুক্ষণ পর এক আর্মি অফিসার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে ঘটেছে এসব। তাকে খুলে বললাম সব। বন্ধুদের সাথে ঘুরতে এসে পথ ভুল করে অন্ধাকারে পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গেছি। অফিসারটি খুব রাগ করলেন। বললেন আমাদের উচিত হয়নি এভাবে এখানে আসা। প্রথমবারের মতো এসেছি আর সবাই ছাত্র, এটা জেনে উনি কিছুটা শান্ত হলেন। বললেন

গত রাতে তারা একটা মিসিং রিপোর্ট পেয়েছে। আমার নাম বলার পর নিশ্চিত করলেন আমার নামেই গতরাতে মিসিং রিপোর্ট হয়েছে।

আর্মি ক্যাম্প থেকে সাহায্য নিয়ে আমি বন্ধুদেরকে ফিরে পেলাম। সেখান থেকে ভালো চিকিৎসার জন্য আমাকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ওখানে হাসপাতালে আমার পায়ে ড্রেসিং করে দেওয়া হলো। একদিন থাকতে হলো আমাদের সেখানে। এরপর আমরা বাসে করে ঢাকায় চলে আসি।

আর হ্যাঁ, আমি ওদের কাছ থেকে শুনেছিলাম সেদিন পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আমি সারারাত যেখান ছিলাম ওটা ছিল একটা কবরস্থান। স্থানীয় বাসিন্দারা ওখানে তাদের মৃতদেহকে কবর দেয়। আমি আমার সারারাত সেই কবরস্থানে কাটিয়েছি। বিভীষিকাময় এক রাত!

নতুন মুখের সন্ধানে

আমার বয়স তখন একুশ। সাংসারিক চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম কিভাবে আমার আয় বৃদ্ধি করা যায়। আয়ের অন্য উৎস খুঁজতে বিভিন্ন জনের কাছে গেলাম, তারা বিভিন্ন পরামর্শ এবং উপদেশ দিচ্ছিল। এর মাঝে আমার নাট্যজগতের এক বন্ধু মারুফ আমাকে পরামর্শ দিল, তুমি তো মঞ্চ নাটকে বেশ কয়েকবারই অভিনয় করেছো, মডেলিং ও করেছো, গানও ভালো গাও তাহলে তুমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রাই করো না কেন? আমি বললাম ফিল্মে যে ট্রাই করব সে সুযোগটা পাব কোথায়? এফডিসিতে গিয়ে বললেই তো আর হবে না যে আমি অভিনয় করতে চাই। আমাকে সুযোগ দিন। তখন আমার সেই বন্ধু আমাকে একটা প্রতিযোগিতার কথা বলল যেটার মাধ্যমে নতুন মুখদের ফিল্মে কাজ করার সুযোগ করে দেবে!

আমি বাসায় এসে চিন্তা করে দেখলাম যেহেতু অভিনয়ের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে তাই এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাব এবং কপাল ভালো থাকলে ফিল্মের হিরোও হয়ে যেতে পারি! যেইভাবা সেই কাজ। খোঁজ নিয়ে দেখলাম বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রোডাকশন হাউজ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সঙ্গত কারণে প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলাম প্রতিষ্ঠানটির গেইটে।

লাইনে দাঁড়ালাম, দেখলাম আমার মত অনেকেই এসেছে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পেশার ছেলে মেয়ে অপেক্ষা করছে লাইনে দাঁড়িয়ে। বেশ নার্ভাস লাগছিল কারণ প্রথমবারের মত এতো বড় একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছি। তো একে একে একজন মেয়ে আর একজন ছেলে ভিতরে যাচ্ছে আর

কিছুক্ষণ পরে বের হয়ে আসছে। অবশেষে আমার ডাক এল। আমি সব নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলে ভিতরে গেলাম।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম চারজন বিচারক বসে আসেন। উনাদের সামনে কিছুটা খালি জায়গা ও লাইট ক্যামেরা আছে। আমি ভিতরে ঢুকতেই আমাকে ২-৩ লাইনের একটা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়ে বলল অভিনয় শুরু করতে। আমি শুরু করলাম অভিনয়। আমার অভিনয় দেখে বিচারকেরা খুশি হয়ে আমাকে পরবর্তী রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত করলেন এবং একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললেন চারদিন পরে আসতে। আমি খুশি মনে বাসায় ফিরলাম।

চারদিন পরে আবার গেলাম ঐ প্রতিষ্ঠানটিতে। এবার শুরু হলো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা, স্কিন টেস্ট, উচ্চারণ ও বিভিন্ন রোলে অভিনয় সবই চলতে থাকল দিন রাত এক করে। আমি আমাকে পুরোপরি সঁপে দিলাম প্রতিযোগিতার মাঝে। কতদিন এমন হয়েছে আমি সকালে এসেছি দুপুর পর্যন্ত অভিনয়ের ক্লাস করে কলা রুটি খেয়ে আবার রাত ১০-১১ টা পর্যন্ত পরীক্ষা দিতাম। দিনশেষে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে আবার সকালে ছুটতাম অভিনয়ের ক্লাস ধরার জন্য।

তিন সপ্তাহ যাবার পর বিচারকেরা ৫ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করল। আমিও ঐ ৫ জনের মধ্যে একজন ছিলাম। ইতিমধ্যে বিচারকদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ মার্কস এবং প্রশংসা পেয়ে আমার ভিতরে কনফিডেন্স বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। সবাই ধরেই নিয়েছিল এই প্রতিযোগিতায় আমিই প্রথম হবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর ভাগ্যের লিখন থাকে আরেক। ফাইনাল রাউন্ডের দিন সকালে বিচারকেরা আরও কিছু পরীক্ষা নিয়ে সবাইকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিছুক্ষণ পর রেজাল্ট জানানো হবে। রুমে চলছে ফিসফাস। এর মধ্যে এক দুজন এসে আমাকে শুভকামনাও জানিয়ে গেছে। আমার মনে চলছে খুশি ও নার্ভাসনেসের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। রেজাল্ট চলে আসল এবং আমাকে বিস্ময় এবং শোকের সমুদ্রে ভাসিয়ে আমাকে বাদ দিয়ে বাকি ৪ জনকে নির্বাচিত করা হলো।

আমার উপর সবার দৃষ্টি অনুভব করতে লাগলাম। মাথায় রাগ চড়ে গেলেও আমাকে নির্বাচিত না করার ব্যাখা জানতে চাইলে আমাকে জানানো হলো আমার হাইট কম থাকার কারণে আমাকে নির্বাচিত করা হয়নি। আমি যখন তাদের বললাম তাহলে প্রথমেই কেন আমাকে বাদ দেওয়া হয়নি, কেনই বা আমার এতগুলো দিন নষ্ট করা হলো? জবাবে তারা বলল যে এই বিষয়টা তখন উনাদের মাথায় ছিল না! স্বজনপ্রীতির ফলে যে আমাকে নির্বাচিত করা হয়নি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম।

মনের দুঃখে চলে এলাম বাসায়। এরপর থেকে আমি আর কখনো অভিনয় করিনি। তবে এ বয়সে এসে মনে হয় আমি তখন প্রতিযোগিতায় না জিতে বেশ ভালোই হয়েছে। আল্লাহই চেয়েছিলেন আমি যেন নায়ক না হয়ে ব্যবসায়ী হই। যদি আমি সেই সময় নির্বাচিত হতাম, আমি সম্ভবত নিজেকে এত বড় কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত করতে পারতাম না। এখন আমি আমার ব্যবসা পরিচালনা করছি, পাশাপাশি বই লিখছি, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং ধারাবাহিক নাটক প্রযোজনা করছি যা একজন নায়ক হিসেবে হয়তো করা সম্ভব হতো না।

ব্যবসায় জীবনের সাময়িক বিরতি

আমি হংকং থেকে নিয়ে আসা পণ্যগুলো নিয়ে বাংলাদেশে এসে পাইকারি ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং ব্যবসায়ীদের সাথে বিজনেস ডিল ফাইনাল করা শুরু করলাম। দিনে দিনে বাড়তে লাগল আমার ব্যবসায়িক পরিসর। এভাবেই কেটে গেল ১ বছর। এক বছর পর আমি এই ব্যবসায়টা ছেড়ে দিলাম কারণ তখন হংকং থেকে পণ্য আনতে হতো লাগেজের মাধ্যমে। পণ্য এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর এয়ারপোর্টে কাস্টমস কর্মকর্তারা তখন পণ্যের পরিমাণ অর্ধেক দেখিয়ে সেই অনুযায়ী কর ধার্য করত। তার বিনিময় তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিতে হতো। তখনকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই এভাবে পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসতো। এই বিষয়টা আমাকে নৈতিকভাবে খুব পীড়া দিত। তাই আমি চিন্তা করলাম এই ব্যবসায়ের সাথে আমি আর জড়িত থাকব না। ইতিমধ্যে আমার চায়ের ব্র্যান্ডটা বেশ জনপ্রিয় হওয়ার কারণে সেখান থেকে ভালো আয় হতে শুরু করে। তাই আমি হংকং থেকে পণ্য আমদানির ব্যবসা বন্ধ করে দেই। এর মাঝে হঠাৎ একদিন আমার সেজো দুলাভাইয়ের কথায় এক ইন্টারভিউ দিয়ে আমার আমেরিকা এ্যাম্বাসিতে চাকুরির সুযোগ তৈরি হয়। চাকুরি হয়ে যাওয়ার কারণে আমি চিন্তা করলাম আমার চায়ের ব্যবসায়টা বিক্রি করে দেওয়ার। যেহেতু আমার চায়ের ব্র্যান্ডটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাই বেশ কিছু ব্যবসায়ী আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন আমার ব্যবসায়টি কিনে নেওয়ার জন্য। আমি ১০ লক্ষ টাকায় আমার ব্যবসায়টি বিক্রি করে দিয়ে ধার দেনা শোধ করা শুরু করলাম এবং চাকুরির পাশাপাশি আমেরিকাতে উচ্চ শিক্ষার চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম। যার কাছে ব্যবসায়টা বিক্রি করেছিলাম তার সাথে চুক্তি ছিল তিনি প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা আমাকে রয়্যালটি বাবদ প্রদান করবে ২ বছরের জন্য। এর ফলে আমার পরিবারের মাসিক খরচের কিছুটা ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিয়ে বিত্তান্ত

নিজের বিয়ের কাহিনী সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে বলে। বিয়ের স্মৃতি নিয়ে সবার মাঝে একধরনের উত্তেজনা কাজ করে থাকে। যদিও আমার বিয়েটা কিছুটা অন্যরকম ও অপ্রত্যাশিতভাবে হয়েছিল। কি ভাবছেন? এই মানুষটার জীবনে এতো অপ্রত্যাশিত কাহিনী কেন? কি আর করব বলেন যার বেঁচে থাকাটাই একটা বড় মিরাকল তার জীবনে যে অদ্ভূত, অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমারোহ থাকবে না তা কি হয়!

যাইহোক ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে আমার বিয়ের ঘটনায় আসি। আমি তখন আমেরিকাতে অবস্থিত অ্যাম্বাসিতে জয়েন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, পাশাপাশি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নেবারও চেষ্টা করছিলাম। আমার পরিবারের লোকজন আমাকে বলল যে বাংলাদেশে এতো ভালো ভালো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থাকতে আমি কেন বিদেশ বিভূঁইয়ে চাকুরি করতে চাচ্ছি। এর আগে পড়ালেখার জন্য আমাকে ৩ বছর ভারতে থাকতে হয়েছে। তাই আমার মা চাচ্ছিলেন না আমি এখনই আবার বিদেশ চলে যাই।

অ্যাম্বাসির চাকুরিটা তখন আমি ঝুলিয়ে রেখে বাংলাদেশে বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরির জন্য এপ্লাই করতে থাকি। এর মাঝে একদিন একটা স্বনামধন্য কসমেটিকস কোম্পানী থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক এলো। আমার বড় দুলাভাই আমাকে বললেন যে, যাও ইন্টারভিউ দিয়ে আসো। আমার পরিচিত এক লোক আছে উনাকে বলেছি তোমার কথা। মজার বিষয় হচ্ছে আমাকে ইন্টারভিউ কল করা হয়েছিল সেই অফিসে না বরং গুলশানে উইম্পি নামে এক রেস্টুরেন্টে।

আমি আমার সিভি নিয়ে গেলাম রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসার দুই মিনিট পর এক মাঝারো বয়সী ভদ্রলোক আসলেন আমার টেবিলে। যদিও আমি আশা করেছিলাম আরও ২-৩ জন লোক থাকবে। যাইহোক আমি তাকে দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। উনি আমাকে

বসতে বললেন। উনি আমার সিভি নিলেন, একনজর দেখে আমাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা শুরু করলেন। কোথায় পড়াশোনা করেছি? বাসায় কে কে আছেন? বাংলাদেশে থাকার ইচ্ছা নাকি বাহিরে চলে যাব, ইত্যাদি। আমিও বাধ্য ছেলের মত সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তো ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হলে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কিছু খাবো কি না? আমি বিনয়ের সাথে না বলার পর উনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে মিরাজ সাহেব আপনার সাথে আমরা পরে যোগাযোগ করব।

আমি বের হয়ে এলাম রেস্টুরেন্ট থেকে আর ভাবতে লাগলাম চাকুরিটা মনে হয় না হবে। কারণ উনি আমাকে পড়াশোনা সম্পর্কে বা কাজ সম্পর্কে তেমন কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। শুধু ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করে সময় পার করেছেন। এই ইন্টারভিউ থেকে চাকুরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু ভাগ্য আপনার জীবনের মোড় ঠিক কিভাবে ঘুরিয়ে দিবে সেটা আপনি কখনো ভাবতেই পারবেন না।

যাই হোক ইন্টারভিউ দেওয়ার দুদিনের মাথায় আমার বড় দুলাভাই আমাকে এসে বললেন যে মিরাজ তোমার জন্য একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। এ কথা শুনে আমার তো আক্কেলগুড়ুম। আমি বললাম ভাইয়া আমি তো এখন বিয়ে করতে চাই না। আপনি তো জানেন আমি হয়তো আর কিছুদিন পড়েই চাকুরিতে জয়েন করব। আর এর পাশাপাশি পড়াশোনা করার জন্য আবার বিদেশে পাড়ি জমাতে পারি। দুলাভাই বললেন সেটা তো আমি জানি। যার সাথে তোমার বিয়ের কথা চলছে সেই মেয়েও বাইরে যাবে পড়াশোনা করতে। দুজনে একসাথে পড়াশোনা এবং সংসার করবে! পড়াশোনা শেষ করে যদি দেশে ফিরতে চাও ফিরবে, না হলে ওখানেই থেকে যাবে। আমি এখন বিয়ে না করার পক্ষে আমার ভান্ডারে সংগ্রহীত সব যুক্তি দিয়ে দুলাভাইকে বোঝাতে থাকলাম। কিন্তু দুলাভাই তার জায়গায় অনড়। আমাদের পরিবারে বড় দুলাভাইয়ের কথার উপর সাধারণত কেউ কথা বলেন না। একে একে দেখি আমার মা, বোন, দুলাভাইয়েরা সবাই একদলে যোগ দিলেন। আমি একটু সার্পোটের জন্য বন্ধুদের কাছে

গেলাম সমস্যা বলতে। ওমা ওরাও দেখি আমাকে বিয়ে করার উপকারিতা সম্পর্কে বেশ লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে দিল!

আমি তখন মাত্র গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি। সদ্য একটা ব্যবসা ছেড়ে নতুন চাকুরি খুঁজছি। আয় রোজগারও খারাপ না। এই বয়সে আমার ক্ষুদ্র কাঁধে বিয়ে নামক এতোবড় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে রাগ করে বাসা ছাড়লাম!

উঠলাম এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধুকে বলে দিলাম বাসার কেউ আমার খবর জানতে চাইলে ও যেন বলে আমার সাথে দেখা হয়নি। যাইহোক দুদিন পরে আমার বন্ধু আমাকে খবর দিল আমার মা নাকি খুবই অসুস্থ। খবরটা শোনার পর খুব অপরাধবোধ কাজ করল। যে মায়ের নাড়ি ছিঁড়ে বের হয়েছি, যার কোলে খেলা করে বড় হয়েছি, আমাকে মানুষ করতে যে মা এতো কষ্ট সহ্য করেছ, সেই মা আমার অসুস্থ অথচ আমি কিনা রাগ করে বন্ধুর বাসায় এসে বসে আছি!

খবর পাওয়া মাত্রই ছুটলাম বাড়ির দিকে। বাসায় গিয়ে দেখলাম আমার পরিবারের সবাই উপস্থিত। মা আমাকে নিয়ে টেনশন করার কারণে অসুস্থ হয়ে গেছেন। মা শুয়ে ছিলেন, মার পাশে গিয়ে বসলাম। মা আমার হাত ধরে বললেন, "দেখ আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো করতেই হবে। যেহেতু ভালো একটা মেয়ে পেয়েছি, ভালো পরিবার পেয়েছি, বিয়েটা করেই ফেল। মেয়ে খুবই ভালো, ধার্মিক মেয়ে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, এতো বড় ঘরের মেয়ে কিন্তু খুবই সাধারণভাবে চলাফেরা করে। তুই আর অমত করিস না। সবাই যখন বলছে তখন তোর ভালোর জন্যই বলছে। যেহেতু তুই বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করতে চাচ্ছিস তাহলে বিয়ের পরে দুজনে একসাথে পড়াশোনা করলে, পড়াশোনাটাও ভালোভাবে চালিয়ে নিতে পারবি। আর বিদেশে একা একা থাকবি, তোকে নিয়ে আমার অনেক দুশ্চিন্তা হয়। বউ তোর সাথে থাকলে আমার দুশ্চিন্তাটা একটু কমবে। আমার যা বলার আমি বললাম এবার তুই ভেবে দেখ কি করবি। তবে বিয়েটা হলে আমরা সবাই খুবই খুশি হবো।"

আমি সবার কথা মেনে নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলাম। পাঠক একবার ভাবুন তো আমাদের অবস্থা। আমি এবং আমার বউ কেউ

কাউকে কখনো সামনা সামনি দেখিনি, কথাও বলিনি। শুধু দুজন দুজনার ছবি দেখেছি আর পরিবারের সবাই মিলে যখন পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম তখন শুধু এক নজর দেখেছি! তারপরও আমরা বাঁধা পড়তে চলেছি সারাজীবনের বাঁধনে। বিষয়টা এখন অদ্ভুত মনে হলেও আমাদের সময়ে এভাবে প্রায়ই বিয়ে হতো।

আরও একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম পাত্রীর সাথে পরিচিত হবার জন্য। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে যার সাথে আমার প্রথম দেখা হলো তিনি হচ্ছেন আমাকে রেস্টুরেন্টে ভাইভা নেওয়া সেই ভদ্রলোক। উনাকে দেখে আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম। তারপর ভাবলাম হয়তো মেয়েদের পরিবারের কেউ হবেন উনি। কিন্তু চমক তখনো বাকি। আমার দুলাভাই উনাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন উনি পাত্রীর বাবা। উনার সাথে তোমার আগেও দেখা হয়েছিল গুলশানে। আমি উনাকে সালাম দিয়ে মনে মনে বললাম বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমি জানি! আরও কত চমক যে অপেক্ষা করছে কে জানে। দুই পরিবারের সবাই মিলে বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললো।

বিয়ে নিয়ে যেমন আমার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছে সেই সাথে অবিবাহিতদের দল থেকে বেরিয়ে বিবাহিতদের দল ভারি করতে যাওয়ার পরবর্তী ফলাফল নিয়েও চলছে বিস্তর চিন্তার ঝড়। এরকম অদ্ভুত অনুভূতি বিয়ের আগ মূহর্তে সব ছেলে মেয়েরই হয়ে থাকে।

বিয়ের আসনে বসে আমি প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে আমার বউকে দেখলাম। আমার মনে হয় সেও মনে হয় আমাকে একটু দেখল। কাজি সাহেব আমাদের বিয়ে পড়ালেন। কবুল পড়ানোর পর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মনে মনে বললাম, আমি পাইলাম আমি ইহাকে পাইলাম!

গার্মেন্টস শিল্পে আমার পথচলা

আমি এবং আমার স্ত্রী যুক্তরাজ্যে পড়ালেখা করার সময় দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেই দেশে ফিরে একটা সোয়েটার ফ্যাক্টরি করবো। ২০০৪ সালে আমরা দেশে ফিরে আসি। শুরু হয় আমার ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ। ১০০% রপ্তানিমুখী ৬তলা বিল্ডিং এর একটা সোয়েটার ফ্যাক্টরি হবে। আমার শ্বশুরের একটা অব্যবহৃত জমি ছিল। তিনি আমাদেরকে সেই জমিটা দেন ফ্যাক্টরি করার জন্য।

সদ্য পড়ালেখা শেষ করেছি। কন্সট্রাকশনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার শ্বশুরের পরামর্শ ছিল পুরো কন্সট্রাকশনের সাথে সরাসরি লেগে থাকতে। আমি সাহস নিয়ে ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আর ঠিকাদারের সাথে কথা বলে, আর কিছুটা পড়শুনা করে আমি কন্সট্রাকশনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলাম। ফ্যাক্টরির লে-আউট, আর্কিটেক্ট, কন্সট্রাকশন মেটেরিয়াল প্রভৃতি ব্যাপার সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান অর্জন করলাম। চলতে থাকল নির্মাণের কাজ।

পুরো কাজ শেষ করতে আমাদের প্রায় দেড় বছর লেগে গিয়েছিল। এর মাঝে আমি দেশে ফিরেই ট্রেডিং ব্যবসা শুরু করি। দেশ-বিদেশ থেকে বিভিন্ন সরঞ্জাম এনে অন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতাম। ঐ ব্যবসা থেকে ভালো আয় হতো। সেখান থেকে একটা বড় অংশ ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজে ব্যয় হতো।

খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই ফ্যাক্টরির ৪তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেলে। এ ব্যাপারে আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছে আমার এক দুলাভাই। এছাড়াও এ ব্যাপারে পরিচিত-অপরিচিত অনেকের কাছ থেকে সাহায্য পরামর্শ পেয়েছি।

চৌদ্দ হাজার স্কয়ার ফিট করে প্রতি ফ্লোর ৪ তলা শেষ করার পর কিছু ফাইনান্সিয়াল ঘাটতির কারণে বাকি দুইতলা নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেই

ফ্যাক্টরি চালু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার এবং আমার স্ত্রীর নামের অদ্যাক্ষর মিলিয়ে ফ্যাক্টরির নাম দিলাম MP Sweaters Ltd.

শুরু হলো MP Sweaters Ltd.এর কার্যক্রম। প্রথমে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে শুরু করলাম। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিকভাবেই সরাসরি অর্ডার পায় না। অন্য বড় ফ্যাক্টরি থেকে অর্ডার এনে আমাদের ফ্যাক্টরিতে প্রডাকশন হতো। খুব ভালো ভাবে চলতো সবকিছু। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোয়ালিট অনুযায়ী অর্ডার ডেলিভারি করতাম। এভাবে কাজ করার মাত্র ৬ মাসের মাথায় আমরা প্রথম সরাসরি এক্সপোর্ট অর্ডার পাই। সেটা বায়িং হাউজের মাধ্যমেই হয়।

বিগত ৬ মাস সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখি। আমি মনে করি আমার সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রিতে উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল সেই ৬ মাস। সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রির খুটিনাটি তথ্য, সুবিধা-প্রতিবন্ধকতা, চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ সুযোগ এই ব্যাপারগুলো বুঝে নিলাম এই সময়ের মধ্যে। আমার প্রতিষ্ঠানকে সেসকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার জন্য ঢেলে সাজালাম। অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য কিছু ফ্যাক্টরি ভিজিট করলাম, তাদের অপারেশন মেথড দেখলাম, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ করলাম। সবকিছু বুঝে আমি আমার ফ্যাক্টরিতে একাউন্টস, স্টক, প্রডাকশন, সবকিছুর হিসাব অটোমেটেড করার জন্য আইটি ফার্মকে দিয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপ করলাম, ওয়ার্কিং শিফট ডিজাইন করলাম, প্রডাকশন এন্ড অপারেশন মেথড সাজালাম।

সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সোয়েটার শ্রমিকদের মাসিক বেতন হয় মূলত প্রডাকশনের উপর। সোয়েটারের বিভিন্ন পার্ট আলাদা আলাদা তৈরি করতে হয়। এক এক পার্ট তৈরির মজুরি একেক রকম। আবার ডিজাইন ভেদে এই রেট কম বেশি হয়। শ্রমিকরা সারা মাসে কে কত পিস পার্টস তৈরি করতে পারলো তার উপর তার বেতন হয়। এর সাথে প্রডাকশন বোনাস যুক্ত হয়।

এই রেট নিয়ে শ্রমিকদের সাথে প্রায়ই মালিক পক্ষের অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ শ্রমিকদের প্রত্যাশিত রেট বিভিন্ন কারণে মালিক পক্ষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অসন্তোষ থেকে ধর্মঘট, ভাংচুর,

মারামারি বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। আমাদের দেশে এটা অনেকটাই নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার ছিল।

এছাড়া সোয়েটার ইন্ড্রাস্ট্রিতে সারা বছর কাজ থাকে না। বছরে ৭ মাস পুর্নোদ্দমে কাজ চলে। এর পরে ধীরে ধীরে কাজের পরিমাণ খবই কমে যায়। ২-৩ মাস কোন কাজ থাকে না বললেই চলে। কিন্তু ফ্যাক্টরির খরচ কিন্তু বন্ধ থাকে না। ফ্যাক্টরির সমস্ত খরচ তখনো মালিকদের বহন করতে হয়। এটা মালিকদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং।

এসব কিছুর মধ্য দিয়েই আমাদের ফ্যাক্টরি চলছিল। ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে আমাদের প্রডাকশন এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। সেসময় আমি আমার পুরোটা সময় কারখানায় দিতাম। নিজে প্রত্যক্ষভাবে সবকিছু দেখতাম। প্রডাকশন লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেও কাজ করতাম। শ্রমিকদের নায্য পাওনা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতাম। সবার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতাম। এর ফলে শ্রমিকদের সাথে আমার একটি চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়। এর কারণে অন্য আর দশটা ফ্যাক্টরির মতো আমার ফ্যাক্টরিতে তেমন কোন অসন্তোষ ছিল না বললেই চলে।

আমাদের এভারেজ বাৎসরিক রপ্তানি প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধ পায় যা একটা মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য রেকর্ড। তার ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় আমাকে একজন CIP (Commercially Important Person) হিসেবে ঘোষণা করে। এটা আমার জীবনের এখন পর্যন্ত বড় অর্জনগুলোর একটি।

বাবা হবার অনুভূতি

প্রথম সন্তান

বাবা হওয়ার অনুভূতিটা আসলে লিখে ব্যক্ত করার মত নয়। এটা একটা অদ্ভুত স্বর্গীয় অনুভূতি। ২০০৫ সালে আমি সেই অনুভূতির সন্ধান পাই। প্রথম যখন ডাক্তারের কাছ থেকে নিশ্চিত হলাম যে আমি বাবা হতে যাচ্ছি, তখন প্রচন্ড রকম এক উত্তেজনা কাজ করছিল মনের মধ্যে। নতুন একটি পরিচয়, নতুন একটা অনুভূতির কথা সারা পৃথিবীকে জানান দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল এই বলে যে, আমি বাবা হচ্ছি, আমি বাবা হচ্ছি।

আমাদের বিয়ে হয় ২০০০ সালে। বিয়ের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য দু'জনের বিদেশে যাওয়া, নিজেদের ক্যারিয়ারে থিতু হওয়া, সবমিলিয়ে ৫ বছর কেটে গিয়েছিল। ২০০৫ সালে আমাদের প্রথম সন্তান আমানের জন্ম হয়। আমার স্ত্রী প্রথম থেকেই ভীষণ এক্সাইটেড ছিল। তার ভেতরে আরেকটা প্রাণ বেড়ে উঠছে। সে দুনিয়াতে আসবে। তাকে মাতৃত্বের পরিচয় দেবে। মা বলে ডাকবে। এই ভাবনাগুলো হয়তো সব মায়েদের মধ্যেই এক। আর একজন সন্তান তার মায়ের সাথে নাড়ির বন্ধনে বাধা থাকে। তাই নতুন সন্তানের অনুভূতি মায়েদের চেয়ে বেশি আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব না।

বাবা হিসেবে আমার মধ্যেও অনুভূতি ছিল তবে সেটা ভিন্ন রকম। পৃথিবীর অন্য বাবাদের কি রকম অনুভূতি হয় আমি জানি না। আমার মধ্যে অনুভূতি ছিল আল্লাহ সবকিছু ঠিক রাখলে আমি শীঘ্রই বাবা হবো। আমার একটা নতুন পরিচয় হবে। আমার নিজের সন্তান, আমার হাত ধরে হাঁটা শিখবে। আমি ওকে মানুষ করব।

অনুভূতিগুলো মায়েদের থেকে অনেকটা আলাদা। মায়েরা যেভাব এই অনুভূতি সারাক্ষণ তাদের সাথে বয়ে বেড়ায়, তাদের ভেতরে ধারণ করে, বাবারা সেভাবে ধারণ করতে পারে না। অন্তত আমার বেলা হয়নি।

আমাদের সন্তান যখন পেটে আমার স্ত্রী তখন মাঝে মাঝে পেটের ভেতরে ওর নড়াচড়া আমাকে ডেকে দেখাতো। আমি দেখতাম, স্পর্শ করে বুঝতে পারতাম। পেটের মাঝে একটা বাবু আছে। আমাদের বাবু। এসময়টায় বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়তাম। ধীরে ধীরে ও পেটের মধ্যে বড় হচ্ছিল।

২৪শে অক্টোবর, ২০০৫, আমাদের প্রথম সন্তান জন্ম হয়। ডাক্তার তারিখ দিয়েছিল ২৮ তারিখ। কিন্তু কেন যেন আমার ভেতর থেকে মনে হচ্ছিল বাচ্চাটা এর আগে জন্ম হবে। আমার স্ত্রী প্রথমে সেই কথায় আমল দেয়নি। ২৪ তারিখ বিকালে হঠাৎ আমার স্ত্রী বলল ওর শরীর খারাপ লাগছে। আমি সাথে সাথে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সাথে আমার মা আর বোন ছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে জানালো আজ রাতেই সিজার করতে হবে। আমরা অনুমতি দিয়ে দিলাম।

রাত ৯টা। আমার স্ত্রী অপারেশন থিয়েটারে। সে সময়টা আমার সবচেয়ে টেনশনে কাটতে লাগল। সিজারে অনেক রকম কমপ্লিকেশন হতে পারে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেসময় আমি প্রচণ্ড ঘামছিলাম, আর বুকের মধ্যে ধুকপুক করছিল। মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম যেন সবকিছু সহি-সালামতে হয়ে যায়। সেসময় আমার এবং আমার স্ত্রী পক্ষের সব আত্মীয় স্বজন হাসপাতালে উপস্থিত ছিল। তারা আমাকে সাহস দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে বাচ্চার কান্নার শব্দ ভেসে আসল। নার্স বের হয়ে এসে বলল, সুসংবাদ, ছেলে হয়েছে। মা ও সন্তান দুজনেই ভালো আছে। সংবাদটা পাওয়ার পর আমাদের সবার মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানালাম। নার্স বললেন যিনি বাবা তিনি ভেতরে আসুন। মা ও সন্তানকে দেখে যান। আমি ভেতরে ঢুকলাম। আমার স্ত্রী বেডে শুয়ে আছে। বেশ কাহিল বোঝা যাচ্ছিল। এরপর বাচ্চাকে আমার কোলে তুলে দেওয়া হলো।

ফুটফুটে একটা বাচ্চা। বাচ্চাকে কোলে নেবার পর প্রথমবারের মতো আমি বাবা হবার অনুভূতি ভেতরে ধারণ করতে পারলাম। আমি আজ

বাবা হয়েছি। এই যে আমার সন্তান। নিষ্পাপ ছোট্ট একটা শিশু। সন্তানের প্রতি টান, ভালোবাসা আমি প্রথমবার অনুভব করলাম। সেসময় আবেগে-অনুভূতিতে আমার ভেতর থেকে প্রায় কান্না চলে আসছিল। সম্মান জাগছিল আমার স্ত্রী প্রতি। আমাকে এত সুন্দর ফুটফুটে একটা সন্তান উপহার দেবার জন্য।

বাবুকে কোলে নিয়ে আমি অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে বাবুকে দেখবে। বাবুটা সেসময় দুচোখ বন্ধ করা। সবাই ডাকাডাকি করছে কিন্তু ও চোখ মেলে না। কিছুক্ষণ পর পিটপিট করে এক চোখ খুলে তাকাল। আমার দিকেই তাকাল। দেখল আমি কে। এরপর আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর সে আবার এক চোখে আমার দিকে তাকাল। মনে হলো সে যেন বিরক্ত। মায়ের প্রকোষ্ঠের মতো সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী থেকে তাকে কেন এখানে আনা হলো এই জন্যই বোধহয় তার বিরক্তি।

এরপর আমার স্ত্রীকে বেডে দেওয়ার পর বাচ্চাকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার প্রথম সন্তান জন্মাবার পর আমার স্ত্রীকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। ওকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। এছাড়া সন্তান জন্মদানের পর ওর কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এছাড়া আমাদের সন্তানেরও কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ওর জন্ডিস ধরা পড়েছিল। সেসময় একাধিকবার আমাদেরকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। সব মায়েদেরকেই বোধহয় এই ধরনের জটিলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তবে স্বামী হিসেবে আমি অনুভব করি আমার স্ত্রী আমাদের প্রথম সন্তানের জন্য অনেক বেশিই কষ্ট করেছে।

দ্বিতীয় সন্তান

আমাদের দ্বিতীয় সন্তান যে খুব চঞ্চল আর দুরন্ত হবে সেটা আমরা টের পেয়েছিলাম ও পেটে থাকতেই। ও পেটে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক বেশি নড়াচড়া করে আমাদের জানান দিচ্ছিল, এই বলে

যে! আমি কিন্তু পেটের ভেতর আছি। তুমি সাবধানে থেকে আর আমাকেও সাবধানে রেখো।

২০০৫ সালে আমাদের প্রথম সন্তান আমান জন্ম নেবার ৮ বছর পর ২০১৩ সালে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান আয়ান জন্ম নেয়। ও আসলে টুইন বেবি ছিল। আমার স্ত্রী যখন কনসিভ করে তখন ডাক্তার চেক করে বলেছিল আমাদের জমজ বেবি হবে। সবাই খুব খুশি হয়েছিল জেনে। আমার স্ত্রীর সাথে তখন এ নিয়ে অনেক আলোচনা হতো। দুজন ছেলে হলে নাম কি রাখবো, মেয়ে হলে কি নাম রাখবো, দুজনকে একসাথে কিভাবে পালবো, কে কার দায়িত্ব নেবে এরকম অনেক কথা নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে খুনসুটি হতো। আমাদের উভয় পরিবারের সদস্যরাও খুব খুশি ছিলেন এই ব্যাপারে। কেউ কেউ মজা করে বলতো, দুইটা বেবি পালতে তোমাদের অনেক কষ্ট হবে। একটা বেবি আমাদেরকে দিয়ে দিও। এখন আত্মীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় বেবি কে নিবে এটা নিয়েও একটা মজার লড়াই চলতো।

সবকিছু ঠিক ঠাক ছিল। ৪ মাসের মাথায় যখন আমরা হেলথ চেকাপের জন্য ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তার সব পরীক্ষা করে বললেন, আপনার স্ত্রী পেটে যেই টুইন ফিটাস ছিল তার মধ্যে একটাতে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি আপনাদের দুইটা বেবির মধ্যে একটা হয়তো বাঁচবে না। তবে ঘাবড়াবেন না। এটা মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা না। গর্ভাবস্থায় অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়ে থাকে। এক্ষত্রে সাধারণত দেখা যায় দুইটা ফিটাসের মধ্যে স্ট্রং ফিটাশটা টিকে যায়। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফিটাশ সার্ভাইব করে না। এটা প্রাকৃতিক কারণেই হয় আর অধিকাংশ সময় প্রাকৃতিক ভাবে ঠিক হয়ে যায়। টেনশন করবেন না। পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। সামনের মাসে আরেকবার আসবেন। তখন ঠিক করে বলা যাবে কী হবে।

একমাস পর ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন আমাদের দ্বিতীয় বেবিটা সার্ভাইব করেনি। ও আস্তে আস্তে পেটের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। তবে ভালো খবর হচ্ছে আমাদের অন্য বেবিটা যে আছে ও খুব ভালো আছে। ওর গ্রোথ, হেলথ দুটোই ভালো আছে।

এরপর শুরু হলো আয়ানের চ্যাপ্টার। ৭-৮ মাস থেকে ওর সক্রিয় উপস্থিতি আমাদের জানান দিচ্ছিল। আমাদের প্রথম সন্তান আমান পেটে থাকার সময় আমার স্ত্রীকে তেমন কোন কষ্ট করতে হয়নি। ও বেশ চুপ চাপ ছিল। সেসময় আমার স্ত্রীর তেমন বমি কিংবা শরীর খারাপ হওয়া তেমন হয়নি। আয়ানের সময় চিত্রটা পুরো ভিন্ন ছিল। পেটের মধ্যে ও অনেক বেশি নড়াচড়া করত, হাত পা নাড়াতো, পেটে লাথি দিত। বাইরে থেকে এসব আমরা বুঝতে পারতাম। আমার স্ত্রী রাতে ভালো ভাবে ঘুমাতে পাড়তো না। বমির জন্য ভালো করে খেতে পারত না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে মজা করে বলতাম, দেখো আমাদের এই বাবুটা অনেক চঞ্চল হবে। আমার স্ত্রী হেসে বলতো, আর দুষ্ট ও হবে। আমাকে যা জ্বালায়।

ওরও জন্ম হয় হাসপাতালে। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়ায় আমাদের দ্বিতীয় সন্তানটি খুব ভালো জন্ম নেয়। ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, মাশাল্লাহ ওর গ্রোথ ভালো ছিল, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো ছিল। আমানের বেলায় আমাদেরকে যতোটা ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে, জন্মের পর থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত আয়ানকে নিয়ে আল্লাহর রহমতে ততোটা যেতে হয়নি।

আমার স্ত্রীকে আমি একজন মা হি্সাবে বলব "অসাধারণ"। আমাদের দুইটা বেবির জন্য ও অনেক কষ্ট করেছে। নিজের উদীয়মান ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজে্র সন্তানদের জন্য সঁপে দিয়েছে। পেশাগত ব্যস্ততা এবং আরো বিভিন্ন কারণে আমার স্ত্রীকে এবং আমার বাচ্চাদের যথেষ্ঠ সময় দিতে পারিনি। আমি এর দায় পুরোপুরি স্বীকার করি। আমার স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার আমি অনেক সময়ই দিতে পারিনি। অভিভাবক হবার দায়িত্ব তাই আমার স্ত্রীকেই বেশি নিতে হয়েছে। সে খুব সফল ভাবেই সেই দ্বায়িত্ব পালন করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে।

গর্ভাধারণের পর থেকে সন্তানদের বড় করে তোলা পর্যন্ত অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে ওকে। আমাদের আজকের দুইটা সন্তানকে যথাযথ যত্নে এবং শিক্ষায় বড় করে তোলার সবচেয়ে বড় ক্রেডিট আমি ওকে দেবো। অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০০তে

৮০ ভাগ অবদানই আমার স্ত্রীর। আমি কোনভাবেই ২০ ভাগের বেশি ক্রেডিট নিজেকে দিতে পারি না।

দুইটা সন্তানকে লালন পালন করতে গিয়ে ওর নিজের উপর অনেক ঝড় গেছে। নিজে অসুস্থ হয়েছে। কিন্তু কখনো দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেনি। কখনো বিরক্ত হয়নি। আমার নিজের প্রতি ও সন্তানদের প্রতি ওর এমন মায়া, ভালোবাসা আর ডেডিকেশনের জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই ওর প্রতি।

জাতিসংঘের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা

জাতিসংঘ (United Nations) বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, যার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘ সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস, জাতিগত দ্বন্দ্বের অবসান, যুদ্ধ বন্ধ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে জাতিসংঘের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমার বৈচিত্রময় কর্মজীবনের এক অন্যতন অর্জন জাতিসংঘের হয়ে কাজ করতে পারা। ২০১৭ সালে আমার সুযোগ হয় জাতিসংঘের একটি বিশেষ প্রজেক্টে Assistant Project Director হিসেবে কাজ করার। জাতিসংঘে যুক্ত হবার ঘটনাটা আমার কাছে এখনো স্বপ্নের মতো। এর আগে জাতিসংঘের সাথে কোনরকম সম্পৃক্ততা ছিল না। কোনদিন ভাবিওনি আমি জাতিসংঘে যুক্ত হবো। সেই অভাবনীয় ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল সেটা বলছি।

সাল ২০১৭। আমার এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু "ড্যানি চাক" থাকতো মালেশিয়াতে। ও ঔখানকার বেশ স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ওখানকার ভাষায় ওকে "দাতো" বলা হতো। একদিন মেসেঞ্জারে আলাপ করতে করতে ও আমাকে বলল, জাতিসংঘের একটি প্রজেক্টের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে। MBA ডিগ্রী আছে এবং বিদেশে পড়ালেখার অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে প্রেফার করা হচ্ছে। তুমি চাইলে আবেদন করতে পারো। MBA ডিগ্রী এবং বিদেশে পড়ালেখার অভিজ্ঞতা, দুটোই আমার ছিল। আমি ২০০৩ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস থেকে BBA এবং ২০০৪ সালে যুক্তরাজ্যের সিটি অফ লন্ডন কলেজ থেকে MBA ডিগ্রী অর্জন করি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলাম। আর সে সময়

জাতিসংঘের মতো বিরাট প্লাটফর্মে কাজ করার সুযোগের কথা জেনে খুবই উৎসাহের সাথে আবেদন জমা দিলাম।

আবেদনে শর্টলিস্টেড হয়ে ইন্টারভিউতে আমার ডাক পড়ল। ১৭ই সেপ্টেমবর ২০১৭, দিনটি আমার এখনো মনে আছে। কিছুটা ভীতি যে কাজ করছিল সেটা অস্বীকার করব না। ফর্সা গড়নের, মাথায় পাকা চুল এক ভদ্রলোক ইন্টারভিউতে আমার হাতে একটি ব্যালেন্সশিট ধরিয়ে দিলেন। বললেন, এই ব্যালেন্সশিটে ২টি ভুল আছে। আপনাকে ১২ মিনিট সময় দেওয়া হলো। এই সময়ের মধ্যে ভুল দুটি বের করে এর ব্যাখ্যা করতে পারলে আপনাকে সিলেক্ট করা হবে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে কানাডায় আপনার পোস্টিং দেয়া হবে।

এতো বড় সুযোগ আমার সামনে, এটা ভেবে ভেতর থেকে সুখকর অনুভূতি হচ্ছিল। ভদ্রলোক আমার হাতে ব্যালেন্সশিট ধরিয়ে দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। একা রুমে ব্যালেন্সশিট হাতে নিয়ে আমি ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম জটিল কোন ভুলের জন্য। আমার পড়ালেখা বিজনেস নিয়ে হওয়ায় এবং ফাইনান্স মেজর হওয়ায় মনে সাহস ছিল। ৩ থেকে ৪ মিনিট সময় লেগেছিল বোধহয় আমার ভুল দুটো বের করতে।

ভুল ১–Cash-Book এ বাকিতে বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের তারা সবাই জানবেন বাকিতে বিক্রয় কখনো নগদান বই বা Cash-Book এ আসে না। শুধুমাত্র নগদ লেনদেন এ বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাকে দেওয়া Cash-Book এ বাকিতে বিক্রয় এন্ট্রি দেওয়া ছিল প্রথম ভুল।

ভুল ২-সুনাম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি অস্পৃশ্য সম্পদ। হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় যার গণনীয় (quantifiable) মূল্য আছে। সচরাচর কোন কোম্পানি সুনামের হিসাব রাখে না তবে অন্য কোম্পানি অধিগ্রহণ করার সময় বা অধিগৃহীত হবার পূর্বে পেশাজীবী নিরীক্ষক দ্বারা সুনামের পরিমাণ টাকার অঙ্কে নিরূপিত করে থাকে। এছাড়া ব্যবসায় সুনাম ব্যাল্যান্স শিটে সম্পদের একটি আলাদা অংশ হিসেবে থাকে।

আমাকে দেওয়া ব্যালেন্সশিটে সুনাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটা ছিল ২য় ভুল।

ভুল দুটো মোটেই কঠিন কিছু ছিল না। হিসবাবিজ্ঞানে সাধারণ জ্ঞান থাকা যা কেউ এটা ধরতে পারবে। এখন যেটা বুঝতে পারি সেদিন সেই ভদ্রলোক ঐ ভুল দুটো দিয়ে আমার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বিচার করার জন্য নয় বরং আমার মানসিক দক্ষতা বিচার করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে শান্ত রেখে কিভাবে আমি সমস্যার সমাধান করতে পারি, হয়তো এটাই তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভুল দুটো চিহ্নিত করে এবং ব্যাখ্যা করতে পারায় ভদ্রলোক বেশ প্রসন্ন হলেন। আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন "তোমার প্রজেক্ট কানাডাতে। তুমি কবে জয়েন করতে পারবে?"

আমি আমার সুবিধাজনক সময়ের কথা জানালাম। উনি রাজি হয়ে গেলেন, বললেন "ঠিক আছে, আমি তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখবো। তুমি প্রস্তুতি নাও।"

তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল আমার পাসপোর্টে। বাংলাদেশি পাসপোর্টের সমস্যা হচ্ছে বাইরের দেশগুলোতে যাওয়ার জন্য সহজে ভিসা পাওয়া যায় না। যেহেতু আমার বাংলাদেশি পাসপোর্ট, সেহেতু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভিসা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। সে সময় এগিয়ে আসল আমার সেই বন্ধু ড্যানি চাক। যেহেতু মালেয়শিয়াতে ওর বেশ প্রভাব ছিল এবং ভালো যোগাযোগ ছিল, ও আমাকে দুই দিনের মধ্যে যা যা দরকার সব পূরণ করে আমার ভিসার ব্যবস্থা করে দেয়।

নির্ধারিত দিনে আমি কানাডা ফ্লাই করলাম। ওটা ছিল আমার প্রথম কানাডা ভ্রমণ। কানাডা পৌঁছে আমার প্রজেক্টে Assistant Project Director হিসবে যোগদান করলাম। শুরু হলো জাতিসংঘের সাথে আমার পথচলা।

জাতিসংঘের সাথে আমার প্রথম কাজ

জাতিসংঘের সাথে প্রথম যে প্রজেক্টে আমি যুক্ত হলাম সেটি ছিল এসিডদগ্ধ মেয়েদের জীবন উন্নয়নমূলক একটি প্রজেক্ট। বিশ্বের বিভিন্ন

দেশে নারীরা এসিড আক্রমণের হুমকির সাথে বসবাস করে। বিশ্বব্যাপী, বছরে প্রায় দেড় হাজার অ্যাসিড হামলা হয়, কিন্তু এটি এমন একটি অপরাধ যা প্রতিশোধের ভয়ে প্রায়ই রিপোর্ট করা হয় না। এসিড হামলার সর্বাধিক বিস্তার ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে, যেখানে অ্যাসিড সস্তা এবং অবাধে পাওয়া যায়।

এসিড হামলায় শিকার হওয়া অধিকাংশই মেয়ে এবং নারী। প্রেম প্রত্যাখ্যান, যৌতুক, পারিবারিক বিরোধ, বৈবাহিক সমস্যা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই বেশিরভাগ এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। এসিড হামলায় বেঁচে থাকা মেয়ে বীভৎস মুখ নিয়ে বেঁচে থাকে, এতে তাদের জনজীবনে জড়িত থাকার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বিবাহ এবং সন্তান ধারণের সম্ভাবনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতিসংঘের সেই প্রজেক্ট ছিল এসিডদগ্ধ মেয়েদের নিয়ে। অনুন্নত দেশগুলোতে এসিড হামলার হার সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশি হিসেবে এসিড হামলার সাথে আমি বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিলাম। এই প্রজেক্টে আমাকে সিলেক্ট করার এটাও হয়তো বড় কারণ ছিল।

এই প্রজেক্টের আওতায় আমারা এসিড হামলার শিকার মেয়েদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, কাউন্সেলিং করা, বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা, আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋন প্রদান করা সহ আরো বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহায্য করতে পেরেছিলাম। এসিডদগ্ধরা সমাজের অবাঞ্চিত নয়, তারা অসহায়-পরনির্ভরশীল নয়, বরং তাদের স্বনির্ভর করে তোলার লড়াই ছিল আমাদের সবার। তাদের নতুন পরিচয় দেওয়া হতো, নতুন পাসপোর্ট, নতুন ব্যাংক একাউন্টের ব্যবস্থা কবে দেওয়া হতো। অতীতের কালিমাময় ইতিহাস ঢাকা পড়ে যেত তাদের নতুন পরিচয়ের আড়ালে। আমেরিকা কিংবা কানাডার মতো দেশ ছাড়া এই রকম সুবিধা হয়তো অন্য দেশে সম্ভব না।

এই প্রজেক্টে আমরা বিভিন্ন দেশের এসিডদগ্ধ মেয়েদের পেয়েছিলাম। এর মধ্যে ৪-৫ জন বাংলাদেশি মেয়ে ছিল, ভারত ও পাকিস্তানের

কয়েকজন মেয়ে এবং এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলো থেকে কয়েকজন মেয়ে ছিল।

জাতিসংঘের সাথে আমার দ্বিতীয় কাজ

জাতিসংঘের প্রথম প্রকল্প সফল ভাবে সম্পন্ন হবার পর আমাকে দ্বিতীয় প্রজেক্টের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় মালয়েশিয়াতে। বলে রাখা ভালো, মালয়েশিয়াতে সারাবছর ধরেই উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজ করে। বাংলাদেশ যেমন বৈচিত্র্যময় ৬ ঋতুর দেশ, মালয়েশিয়ায় সেই বৈচিত্র্য নেই। এখানে নেই কোনো শরৎ, হেমন্ত ও শীতের মতো ঋতু। সারা বছর এমনই বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়া বিরাজ করে এই দেশে। দিনে তাপমাত্রা থাকে ৩০° সে. এর মতো আর রাতে ২২° সে. এর মতো থাকে। নিরক্ষরেখার খুব কাছে হওয়াতেই এমন আবহাওয়া। হালকা শীত অনুভূত হয় শীতকালহীন কেবল জানুয়ারি মাসজুড়ে। তবে, বৃষ্টি কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না। আর ভোরের সোনালি সূর্যোদ্বয়ের পর পরই পাল্টে যায় আবহাওয়া প্রেক্ষাপট। কিছুটা ব্যতিক্রম আবহাওয়া থাকে মার্চ মাসে। এখানে পরিষ্কার আকাশের পূর্ণদিন পাওয়া যায় না বললেই চলে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দমিয়ে রাখে রোদের দাপট। আবহাওয়ার বড় ধরনের পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব একটা হয় না। বড় জোর অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যা ভোগায় সাময়িকভাবে। তবে এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট টাইফুন ফিলিপাইন পেরিয়ে আঘাত হানে পূর্ব মালয়েশিয়ায়।

মালয়েশিয়াতে জাতিসংঘের আমার দ্বিতীয় প্রজেক্ট ছিল পেনাং রাজ্যে জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রকল্প। অনেক অনেক জেলে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মালয়েশিয়ার সমুদ্রে পাড়ি জমায় মাছ ধরার জন্য। ওরা খুবই দরিদ্র হয়ে থাকে। নিজেদের বাড়ি ঘর তেমন থাকে না বললেই চলে। দিন আনে দিন খায় এমন অবস্থা।

একবার এক ঘটনা ঘটলো। কিছু জেলে সমুদ্রে পাড়ি জমায় মাছ ধরতে। প্রায় ১৮-২০ দিন হয়ে যাবার পরেও তাদের কোন খোঁজ

পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে কোস্টগার্ড যখন তাদের উদ্ধার করে তখন তাদের গায়ে মাংস বলে কিছু ছিল না। কঙ্কালসার দেহে সবাই এতদিন কিভাবে খেয়ে না খেয়ে বেঁচে ছিল এটাই অনেক অবাককর বিষয়। পরবর্তিতে তাদের মুখে শোনা যায় প্রচণ্ড তৃষ্ণায় তারা নিজেদের প্রস্রাব পান করে তৃষ্ণা মিটিয়েছে। চারিদিকে থইথই পানি, কিন্তু তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এক ফোটা পানি নেই।

আমার সেই প্রজেক্ট ছিল সেই সব দরিদ্র জেলেদের আবাসনের ব্যবস্থা, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুযোগ করে দেওয়া, সর্বোপরি তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। সেই প্রজেক্টটিও আমরা সফল ভাবে সমাপ্ত করি।

এরকম আরো কিছু প্রজেক্টে আমার সুযোগ হয়েছিল জাতিসংঘের সাথে কাজ করার। আমি সবসময়ই চেষ্টা করেছি দায়িত্ব ও সততার সাথে কাজ করে যাবার। মানুষ হিসেবে সামাজিক মূল্যবোধ সবসময় আমাকে প্রেরণা দিয়েছে পুর্নোদ্দমে কাজ করে যেতে। আর এর যথাযথ মূল্যায়নও আমি পেয়েছি। ২০২১ সালে ইউএন বাংলাদেশ যুব ভিশন যুব উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আমি পুরস্কার লাভ করি। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থায় অবদানের জন্য বিভিন্ন পুরষ্কার পাবার সুযোগ আমার হয়েছে।

তবে নিজের মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে দীর্ঘদিন দূরে থাকা আমার কখনই হয়ে উঠেনি। আমার ছোট দুইটি ছেলে বাবার আদর ছাড়া বড় হচ্ছিল। ওদের মানুষ করার দায়িত্ব আমার কাঁধে। দূরে থেকে যেটা আমি পুরোপুরি পালন করতে পারছি না বলে মনে হচ্ছিল। আর আমার বৃদ্ধা মা, তাকে ভীষণ মনে পড়ছিল। উনার এই বয়সে সন্তান হিসেবে আমার পাশে থাকা খুবই দরকারি ছিল। তাই ২০১৯ সালে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি।

কোমায় ছত্রিশ ঘণ্টা

কানাডাস্থ জাতিসংঘের একটি প্রজেক্টের কাজে আমেরিকার অরিগন রাজ্যে আমার আসতে হয়েছিল, সাথে ছিল আমার বন্ধু উডওয়ার্ড। অরিগনে আমরা বেশ ব্যস্ত সময় পার করছিলাম। যদিও অরিগনে আমি আসতে চাচ্ছিলাম না কারণ আমার শরীর খুব একটা ভালো ছিল না। তারপরও কাজের চাপের কারণে আসতে বাধ্য হলাম। অরিগন শহরটি আমেরিকা এবং কানাডার বর্ডারে হওয়ার কারণে পার্সপোট ছাড়াও যাওয়া আসা করা যায়। সমুদ্র বেষ্টিত এই শহরটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখ ধাঁধানো।

তো অরিগন যাওয়ার প্রথম দিনটা উবে গেল কাজের চাপেই। দ্বিতীয় দিন কাজ শেষ হয়ে গেল বিকেলেই। আমরা উঠেছিলাম কোয়ালিটি ইন সি সাইট হোটেলে। হোটেলে গিয়ে আমি আর উডওয়ার্ড কফি নিয়ে আলোচনা করতে বসলাম কিভাবে বিকেলটা পার করা যায়। আমাদের হোটেলটি ছিল সমুদ্রের একদম পাশে। জানালা থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকে সমুদ্র। বেশ লাগছিল কফি খেতে খেতে সমুদ্র দেখা। তো আলোচনা করে আমরা স্থির করলাম ডিনার সেরে আমরা একসাথে বের হবো বাইরে। আমেরিকা বা কানাডাতে সাধারণত ৬ টা থেকে ৭ টার মধ্যেই সবাই ডিনার শেষ করে ফেলে। কফি শেষ করে আমি যখন শাওয়ারে যাচ্ছিলাম তখনই বুঝতে পারছিলাম আমার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। একবার চিন্তা করলাম যে শরীর যেহেতু খারাপ লাগছে তাহলে হোটেলেই থাকি। আবার চিন্তা করলাম যে এই ভর সন্ধ্যায় হোটেলে শুয়ে শুয়ে সময় কাটানোর চাইতে সমুদ্রের পাড় থেকে ঘুরে আসলে মনে হয় একটু ভালো লাগবে। শাওয়ার যখন নিচ্ছিলাম তখন আমার মনে হলো আমার মাথা প্রচন্ড ঘুরাচ্ছে আর বমি বমি ভাব হচ্ছে। এর একটু পরেই বুকের একপাশে হালকা চাপা ব্যথা অনুভব করলাম। তো আমি চিন্তা করলাম হট শাওয়ার নিয়ে দেখি, অনেক সময় হট শাওয়ার নিলে শরীরটা ঝরঝরে লাগে। হট

শাওয়ার নেওয়া শুরু করতেই অনুভব করলাম আমি জ্ঞান হারাচ্ছি। এরপরের স্মৃতিগুলো আমার চেতনায় ছিল না। উডওয়ার্ডের মুখে পরে আমি যেটুকু জানতে পেরেছিলাম সেটাই হুবহু আপনাদের জানাচ্ছি।

"তোমার দেরি হচ্ছিল বলে আমি হোটেল লবিতে অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য। কিন্তু তোমার আসার কোনো নাম গন্ধও নেই। তাই ভাবলাম ফোন করে তোমাকে তাড়া দেই নিচে নামার জন্য। আমি ক্রমাগত তোমাকে ফোন দিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু তোমার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পর আমি তোমার রুমের সামনে এসে নক করলাম, কলিংবেল চাপলাম কিন্তু তোমার কোনো সাড়াই নেই। আমার মনে তখন কু ডাক ডাকল। আমি তাড়াতাড়ি হোটেলের কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানিয়ে বললাম দ্রুত মিঃ মিরাজের রুমের দরজা খোলার ব্যবস্থা করতে। হোটেল কর্তৃপক্ষ এক্সট্রা চাবি নিয়ে এসে তোমার রুমের দরজা খোলার পর দেখতে পেলাম তুমি অচেতন হয়ে ওয়াশরুমের মেঝেতে পড়ে আছো। তোমার সারা শরীর ঠান্ডা আর সাদা হয়ে গেছে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম তুমি বোধহয় মারা গেছো! তোমার পালস চেক করে দেখলাম হালকা নিশ্বাস চলছে কিন্তু তোমার কোনো চেতনা নেই। সাথে সাথে ইমার্জেন্সিতে ফোন দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হলো। এ্যাম্বুলেন্স এলে তোমাকে নিয়ে ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। অরিগনের বিখ্যাত হসপাতাল হচ্ছে হার্নি ডিসট্রিক্ট হসপিটাল, অরিগন। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে ডাক্তার তোমাকে ইমার্জেন্সিতে তে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন কর্তব্যরত ডাক্তার এসে আমাকে বললেন, তোমার রোগীতো কোমাতে চলে গেছে। উনাকে যতদ্রুত সম্ভব আইসিইউতে ট্রান্সফার করা হচ্ছে।

যেহেতু বাইরে দেশগুলোর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হেলথ ইন্সুরেন্স, পরিবারের সদস্যদের আইডি কার্ডের নাম্বার দিতে হয়, ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন উনি তোমার কে হন? আমি বললাম কলিগ। তখন উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন উনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার কি এখানে থাকেন? আমি বললাম না, এখানে উনার কেউ থাকেন না। ডাক্তার অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে আমার কার্ড নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা শুরু করে দেয়।

ডাক্তাররা তোমার বিভিন্ন টেস্ট করে রিপোর্টগুলো নিয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে বসে একটা ডিসিশানে পৌঁছালো। উনাদের ভাষ্যমতে তোমার ব্রেইন কোনো কারণে মনে করেছে তোমার শরীরে বিষাক্ত কিছু প্রবেশ করেছে বা করবে যার ফলে তোমার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সে জন্য ব্রেইন অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য তোমার গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক অঙ্গগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে কোমায় নিয়ে যায়। এ অবস্থাকে মেডিকেলের ভাষায় "Persistent Vegetative State" বলা হয়।"

এখানে একটু বলে রাখি, এই কোমা অবস্থায় আক্রান্ত রোগী সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ঘুম এবং এক ধরণের জাগরণ চক্রের মাঝে অবস্থান করে। ব্রেইন তার কার্যক্রম সীমিত করে দেওয়ার কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হাত পা, চোখ, নাক তার কার্যক্ষমতা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়, মাসল মুভমেন্ট হয়না, ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না এবং পয়ঃপ্রণালীও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

রোগটা বিরল হওয়ার কারণে ডাক্তাররাও আমাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করে আমার চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করলেন। উডওয়ার্ডের কাছ থেকে আমার যাবতীয় অতীত ইতিহাস, খাদ্যভাস ইত্যাদি জেনে নিয়েছিলেন যাতে এ রোগের কারণ সম্পর্কে কোনো ক্লু বের করা যায়। টেস্টের রিপোর্টগুলো আসলে ডাক্তাররা দেখলেন যে আমার বডি মাসলে কোনো সমস্যা নেই, হার্টের অবস্থাও বেশ ভালো। ডাক্তাররা তখন দুইটা কারণের কথা বললেন যার কারণে আমার এ সমস্যা হতে পারে। যদিও সমস্যাগুলো সবই মানসিক।

এর মধ্যে একটা কারণ ছিল আমার দীর্ঘদিন একা থাকার অভ্যাস। যেহেতু আমি দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপন করেছি তাই আমাকে এ্যাপার্টমেন্টে একাই থাকতে হতো। প্রবাসে আত্মীয় স্বজনহীন জীবন যে কত যন্ত্রণার সেটা একমাত্র প্রবাসীরাই ভালো বুঝবে। যদিও বাংলাদেশি কমিউনিটি থাকলে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু আমি যেখানে থাকতাম সেখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি ছিল না বললেই চলে। তো এরকম একা জীবন যাপনের কারণে আমার মনে

নিঃসঙ্গতার চাপ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন মহীরুহ আকার ধারণ করে তখনই ব্রেইন একরম আচরণ করতে পারে বলে জানান ডাক্তাররা।

যাইহোক উডওয়ার্ডের জবানিতে ফিরে আসি।

ডাক্তাররা আমাকে জানালো ২৪ ঘণ্টার আগে তোমার শারীরিক অবস্থা কোনদিকে মোড় নিবে সেটা বলা যাচ্ছে না! যদি তোমার অঙ্গগুলোতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুভূতি ফিরে আসতে শুরু করে তাহলে ধরে নিতে হবে তুমি এ যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তোমার অঙ্গগুলো কাজ করা শুরু না করলে তোমার আশা ছেড়ে দিতে বললেন ডাক্তারেরা। আমি পড়ে গেলাম বিপদে কারণ এই খবরটা বাংলাদেশে তোমার আত্মীয় স্বজনদের জানানো প্রয়োজন। কিন্তু তোমার মোবাইলটা আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম!

যাইহোক ২৪ ঘণ্টা পর ডাক্তাররা আমাকে জানালো তোমার ডান চোখের পাতা হালকা নড়ছে এবং তোমার পায়ের পাতায় ধীরে ধীরে অনুভূতি ফিরে আসছে। ডাক্তাররা তোমার অবস্থা দেখে আশাবাদী হয়ে উঠলো। আমাকে আশ্বাস দিল তুমি হয়তোবা এ যাত্রায় বেঁচে যাবে। ৩৬ ঘণ্টা পর তুমি প্রথম চোখ খুললে এবং আস্তে আস্তে মুখ নাড়ালে। আমার দিকে তাকিয়ে কাছে আসতে ইশারা করলে। আমি তোমার কাছে গেলে তুমি প্রথম আমাকে বললে আমি কতদিন ধরে এখানে আছি? আমি বললাম প্রায় দুইদিন। তুমি বললে এই দুইদিন আমাকে না খাইয়ে রেখেছো, যাও কিছু খাবার নিয়ে এসো।

উডওয়ার্ডের জবানি থেকে বের হয়ে এখন কোমায় থাকাকালীন সময়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। আগেই বলেছি আমি ছিলাম আধো জাগরণ আধো ঘুমে। যদিও আমার বডি মুভমেন্ট করছিল না কিন্তু আমার ব্রেন আংশিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই কারণে তখনকার কিছু স্মৃতি আমার ব্রেনের সেলে জমা ছিল। আমি বেশ কিছু অদ্ভূত টাইপের স্বপ্ন দেখছিলাম তখন। আমার মৃত বাবা, আমার ভাই, মৃত দাদীদের দেখছিলাম তখন। এছাড়াও পরিচিত অপরিচিত, যাদের চেহারা ভুলে গিয়েছিলাম, যাদের চিনিনা সেসব মানুষকেও দেখতে

পেতাম। তারা আমার স্বপ্নে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো, চলাফেরা করত, আমার পাশে এসে বসতো। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতো না।

আরও একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন। দেখতাম যে আমি উড়ে যাচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে স্বপ্নে আমার কোনো ডানা ছিল না। ডানাবিহীন অবস্থায়ও আমি ভেসে বেড়াচ্ছি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। কিন্তু যেখানেই আমি উড়ে যাচ্ছিলাম সেখানেই আমার চোখে পড়ছিল ধবধবে সাদা রং, সাদা সাদা মেঘ। দৃষ্টিসীমায় যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু সাদা আর সাদা। যেন আমার এই স্বপ্নের জগতে সাদা রং ছাড়া আর কোনো রংয়ের অস্তিত্ব নেই। উফ কি ভীষণ সেই অভিজ্ঞতা! তখন হয়তো আমি মনে মনে চাইছিলাম একটু রং দেখার! ধবধবে সাদা এই দুনিয়া হয়তো আমার অসহ্য লাগছিল।

কোমার মাঝেই আমি শুনতে পেতাম কেউ যেন আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে আমাকে কিছু বলছে। যদিও ফিসফিস শব্দটা এতোটাই আস্তে ছিল যে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না কিন্তু কথাগুলো যে বাংলায় ছিল সেটা বুঝতে পারতাম। একবার মনে হতো এটা আমার মায়ের গলা, আবার মনে হত না এটা মায়ের গলা না এটা আমার খুব পরিচিত গলা যাকে আমি চিনি কিন্তু তার নাম মনে করতে পারছি না।

সবচাইতে অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে কোমায় থাকাকালীন স্বপ্নে আমি একটা লেক দেখেছিলাম। একবার দুবার না বেশ কয়েকবার। চারদিন পর যখন আমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দিল তখন উডওয়ার্ড আমাকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালের পাশের একটা লেকের পাড় ধরে। লেকটা চেনা চেনা মনে হতেই আমি ওকে বললাম গাড়ি থামাতে। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? তোমার কি আবার শরীর খারাপ লাগছে? আমি বললাম না আমি ঠিক আছি কিন্তু আমি লেকটা দেখতে চাচ্ছি। উডওয়ার্ড আমাকে বলল এই সাধারণ লেক দেখে কি করবে এর চাইতে তুমি বরং হোটেলে চলো, ফ্রেশ হয়ে

বিশ্রাম করো। ওর কথা না শুনে আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম লেকের পাড়ে।

হলফ করে বলতে পারি কোমায় থাকা কালীন আমি স্বপ্নে যে লেকটা বারবার দেখেছি এটাই সেই লেক! সেই লেকের পাড়, চারপাশে গাছ, কাঠের ব্রিজ, বসার জায়গা হুবহু সবই এক। আমি যদি লেকটাকে আগে কখনো দেখে যেতাম তাও হয়তো বুঝাতে পারতাম যে এই লেকটার স্মৃতি আমার মনে জমা ছিল তাই বোধহয় এটাকে দেখেছি। কিন্তু এ লোকটাকে আমি আজই প্রথমবার দেখছি এবং আমাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আমি অচেতন ছিলাম। তাই লেক দেখার প্রশ্নই আসে না। লেকের মাঝে একটা কাঠের ব্রিজ ছিল। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম কাঠের ব্রিজের দিকে। উডওয়ার্ড আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল এতো অবাক হয়ে এই কাঠের ব্রিজটির দিকে তাকিয়ে আছো কেন? আমি বললাম আমি কোমায় থাকা অবস্থায় স্বপ্নে এই ব্রিজটি বহুবার দেখেছি। উডওয়ার্ড হাসতে হাসতে আমাকে বলল "তুমিতো এই লেকের পাড়েই কখনো আসোনি। তুমি এই ব্রিজ দেখবে কিভাবে? তখন আমি ওকে বললাম আমি হলফ করে বলতে পারি এই ব্রিজ আমি দেখেছি এবং এই ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কাঠের পাটাতন নেই। ও অবাক হয়ে বলল এটা কিভাবে বললে তুমি! চলো তো দেখি আসলেই পাটাতনটি আছে কিনা। আমরা ব্রিজে উঠে কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখলাম উডওয়ার্ড একবার আমার দিকে আর একবার ব্রিজের পাটাতনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল ও ভূত দেখছে। আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম ব্রিজে একটি পাটাতন নেই! এই মিসিং পাটাতনটিকেই আমি কোমায় থাকার সময় বহুবার দেখেছি। উডওয়ার্ড এবার আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন আমি পৃথিবীর অষ্টম আর্শ্চয! খানিক চুপ থেকে আমাকে বলল চলো হোটেলে ফিরে যাই।

এই কাঠের ব্রিজ এবং লেকের রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারিনি। এটাকে কি বলব কাকতালীয় ঘটনা? অবচেতন মনের কারসাজি? এ রহস্য ভেদের ভার নাহয় আপনাদের উপরই দিলাম।

জীবনের জটিল হিসাব

আমার পছন্দের অনেক খাবার ছিল, অনেক পছন্দের পোশাক ছিল কখনও যেগুলো পড়তে পারিনি শুধুমাত্র দেখা ছাড়া। আমার এক জোড়া মাত্রই জুতা ছিল যেটা পড়ে স্কুলে যেতে হত। আমার বন্ধুরা ব্যঙ্গ করে বলত, কিরে তোর কি আর কোন জুতা নাই যে একই জুতা পড়েই প্রতিদিন আসিস। একই জুতা আর কতদিন পড়বি। চেইঞ্জ কর এবার।

আমার জীবনে খুব শখ ছিল যে আমার একটা সাইকেল থাকবে। সাইকেলের জন্য অনেক কান্নাকাটি করেছি। কিন্তু একসময় চিন্তা করলাম কার কাছে কান্নাকাটি করছি? যার কাছে কান্নাকাটি করছি সেতো দিতে পারবে না এটা। যদিও এখন আমি গাড়ি চেপে যাতায়াত করি সবখানে। চাইলেই একাধিক বাইক কেনার সক্ষমতা আমার আছে কিন্তু ঐ সময়ের অনুভূতিটা এখনও বিদ্যমান। আফসোস হয় সেই অতীত সময়ের কথা মনে করে। সময় বহমান। সময় আপনাকে কখন কোথায় নিয়ে যাবে আপনি নিজেও বুঝবেন না।

আমার খারাপ সেই সময়টাতে চাইলে অনেকেই সহায়তা করতে পারত। কিন্তু সময় খারাপ হলে দেখবেন আপন মানুষ দ্রুতই আপনার আশপাশ থেকে সটকে পড়বে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় কারো সাহায্যের আশায় বসে না থেকে নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করা উচিত সফল হবার জন্য। জীবন আপনাকে আপনার গন্তব্যে নিয়েই যাবে শুধু শক্ত করে হালটা ধরে রাখতে হবে আপনার। কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না। পথভ্রষ্ট হওয়া যাবে না। অকূল পাথারেও ভাসতে হবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। জীবনে মৃত্যু একবারই আসে। কিন্তু মরে যাবার আগে বারবার মরা যাবে না। আমি এ কথাগুলোই মনে প্রানে বিশ্বাস করতাম। শুধু বিশ্বাস না, চরম বিশ্বাস।

আমাকে বিপদের সময় যে দুএকজন সাহায্য করেছে সেই টাকার যথাযথ ব্যবহার করেছিলাম আমি। আমার পরিশ্রম, মেধা, কর্মদক্ষতা, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর ভাগ্য, সবমিলিয়ে আমি সফলতার দেখা পেয়েছি। আসলে ভাগ্য বলে কিছু একটা আছে। অনেক সময় ব্যাটে বলে না মেলাতে পারলে আপনি যতই মানুষের হেল্প পান না কেন সেটা দিয়ে আপনি কিছুই করতে পারবেন না।

উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা বলি, আমার কাছের এক বন্ধু খুব বিপদে আমার কাছে আসে। ওর ব্যবসা দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য যত ধরণের সাহায্য আছে আমি সবকিছু করেছিলাম। টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, জনবল দিয়ে, মানসিক সাপোর্ট দিয়ে, ধরতে গেলে প্রায় সমস্ত সত্তা দিয়ে ওর পাশে ছিলাম। কিন্তু একটা সময় দেখা গেল ওর নিজের গাফলতি এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমার সাথে দূরত্ব তৈরি করে ব্যবসা গুটিয়ে অন্য পথে হাঁটা দিল। যার ফলস্বরূপ এখনও ওকে ধার দেনা করেই চলতে হয়। আজও ও স্বাবলম্বী হতে পারেনি। এসব দেখলে আসলে খারাপ লাগে।

আমার বড় ভাই আমার চেয়ে ছয় বছরের বড়। আমার ছোট ভাই আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। তাদের পর্যাপ্ত সাপোর্ট থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা যতটা হওয়া উচিত ছিল অতোটা অগ্রসর হতে পারেনি।

ভাগ্য আপনাকে সবসময় সাহায্য করবে না। সময় ও সুযোগ বারবার আসবে না। সঠিক সময়ে আপনাকে আপনার করণীয় বুঝতে হবে। তাহলেই আপনি সফল হবেন। অফিসের প্রত্যেকটা কাজের সাথে, কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে ওতোপ্রোতভাবে কাজ করি। তাদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করি। নিজে কখনও এমন কোন কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দেই না যেটা তাদের পক্ষে করা অসম্ভব। আমিও মানুষ। সবার কষ্টই আমি বুঝি। বোঝা উচিতও।

যাদের কাছে আমি আজন্মকাল ঋণী

লেখালেখি আমি ছোটবেলা থেকেই করতাম। শখের বশে লেখালেখি আর কি। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস। কিন্তু একবার মা রেগেমেগে আমার সব লেখার ডায়েরি পানিতে ফেলে দেন। বলেছিলেন, যাদের পেটে ভাত জোটে না তারা গল্প, কবিতা লিখে কি করবে? তাদের এসব আয়েশী জিনিস মানায় না। তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। মায়ের প্রতি খুব অভিমান হয়েছিল। এখন আর ওভাবে খারাপ লাগে না। তবে লেখাগুলো থাকলে হয়তো আরও দুই তিনটা বই হয়ে যেত।

তবে আমার একটা ব্যাপার হলো আমি প্রচুর পড়ি সেটা যেকোন বইই হোক না কেন, যেকোন লেখকের বইই হোক না কেন। আমি মুহূর্তের মধ্যেই লেখার মধ্যে ডুবে যেতে পারি। বুঁদ হয়ে থাকি যেকোন লেখায়। পড়তে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। নামিদামি বা বেনামী লেখক একটা হলেই হয়।

জীবনে বড় হবার পেছনে প্রতিটি মানুষেরই দুএকজন নারী পেছনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। তারা পথ বাতলে দেয়, দেখিয়ে দেয়, পাশে থাকে। তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে আমার মা, যেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমার জন্মের পর যে ভীষণ কষ্টের সঙ্গে মা আমাকে মানুষ করেছিলেন সে কষ্ট আসলে অবর্ণনীয়। সে কষ্ট যে কতটা কষ্ট তা তখন আমি বুঝিনি। নিজের সন্তানদের যখন মানুষ করছি তখন বুঝি বাবা মা আসলে কি জিনিস।

দ্বিতীয় জন হচ্ছে আমার স্ত্রী। খালেদা পারভীন পলি। যিনি এখন একটি স্বনামধন্য কসমেটিকস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা, তার ত্যাগ, সবকিছু মিলিয়ে সে চেষ্টা করে আমার পাশে সবসময় থাকার জন্য।

মেন্টাল সাপোর্ট দিয়ে সাহায্য করে সবসময়। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্বশুরের কাছে যিনি সবসময় আমাকে নিজের ছেলের মতো দেখেন এবং বিভিন্ন কাজে আমার উপর আস্থা রাখেন।

এছাড়াও আমার বোনেরা আমার সাথে থাকে ছায়ার মত সাহায্য করার জন্য। আমাদের ১০ সদস্যের এক বিরাট পরিবার হলেও এখনো সবাই সবার সাথে যোগাযোগ রাখি, একে অন্যের বাসায় আসা-যাওয়া হয়, একে অন্যের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।

এছাড়াও আমি ঋণী আমার সেই অংকের শিক্ষকের কাছে যার কারণে আমি এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছিলাম, টাকা ধার দেওয়া সেই মুরুব্বির কাছে যার সাহসে ব্যবসায়ের জটিল জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম।

পরিশিষ্ট

আসলে শেষ বলে কিছু নেই। জীবন ঘটনাবহুল। জীবনের পরতে পরতে প্রতিটি মুহূর্তেই যোগ হয় নতুন গল্প। সেই গল্পের জীবনে আমরা ছুটে চলি আবহমানকাল ধরে। যার কোন শেষ নেই। জীবন পাওয়া না পাওয়ার। সবকিছু পেয়ে গেলে জীবনে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পরে। আমরা কিছু পাইনা বলেই তার জন্য অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকি জীবনভর। জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু অপেক্ষা শেষ হয় না।

সফল ব্যবসায়ী মেরি কে অ্যাশ বলেছিলেন, নিজেকে সীমাবদ্ধ করো না। অনেকেই আছে, সে যেটা করতে পারবে সেখানে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। তুমি ততদূরই যেতে পারবে যতদূর তুমি মনে করো নিজেকে নিয়ে যেতে পারবে। আপনি যা বিশ্বাস করেন, মনে রাখবেন আপনি তাই অর্জন করতে পারেন।

আসলেই তাই। নিজেকে বিশ্বাস করাটা জরুরী। জীবনে বাধা আসবেই। সব উতরে যেতে হবে। নিজের সেরাটা দিতে হবে। ভালো থাকতে হবে। বাঁচতে হবে ভরপুর। এই ছোট্ট জীবনে এত হা-হুতাশ করে কি লাভ। পরিশ্রম করুন আর বিশ্বাস রাখুন নিজের প্রতি, স্রষ্টা আপনাকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেবে।